কেউ নায়ক কেউ নায়িকা

বিমল মিত্র

৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সম্প্রতি বিমল মিত্রের নামে দু-একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।
সে-গুলি আমার লেখা নয়। আমার পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে
জানাচ্ছি যে আমার সমস্ত গ্রন্থে আমার সাক্ষর মুদ্রিত থাকে।

লেখকের **অন্যান্য বই :**

সাহেব বিবি গোলাম

কড়ি দিয়ে কিনলাম

একক দশক শতক

মিথুনলগ্ন

নগর সংকীর্তন

কন্যাপক্ষ

নিবেদন ইতি—

প্রভৃতি

উৎসর্গ

আমার সমস্ত গল্পের নায়ক-নায়িকার
উদ্দেশে

কেউ নায়ক

কেউ নায়িকা

তখন ছোট বেলা। বি.এ পাশ করার পর বাবা বললেন—এবার এ্যাকাউন্‌টেন্সি পড়ো, ওতে অনেক টাকা—

মানে তিনি চার্টার্ড এ্যাকাউন্‌টেন্ট্‌ করতে চেয়েছিলেন আমাকে। অর্থাৎ টাকা আনা পাই-এর হিসেবের কারচুপি করে বড়লোক হওয়া। আমার দশ টাকা আয়কে লোকচক্ষে একশো টাকা দেখিয়ে কেমন করে সকলকে ঠকানো যায় তারই বিদ্যে। সেই একশো টাকাকে আবার হিসেবের গোঁজামিলে দশটাকায় পরিণত করাও যায়। জীবনে এই হিসেবের কাবচুপি বড় কারচুপি। বড়লোককে গরীব করা যায়, গরীবকে বড়লোক। আজকের পৃথিবীতে এ অপরিহার্য। পৃথিবীর অর্থনৈতিক অঙ্ক যত জটিল হচ্ছে, হিসেব-বিশারদদের তত খাতির বাড়ছে। এদের বাদ দিলে রাজ্যও চলবে না, রাজত্বও চলবে [illegible] ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প কিছুই চলবে না। কোর্ট, কাছারি, অফিস, সেরেস্তা, জীবন, মৃত্যু সব অচল হয়ে [illegible]াবে।

ছ মাস ক্লাস করলুম।

ডেবিট্, ক্রেডিট্, বুক-কিপিং, ব্যালেন্স-শীট। [illegible] রকম নাম, অনেক রকম তার কায়দা কানুন। দেখলাম অন্য ছাত্ররা খুব মন দিয়ে শুনছে। কিন্তু আমার কানে তার এক বর্ণও ঢুকলো না। আমি তখন প্রফেসারের কোট-প্যান্টের দিকে তাকিয়ে দেখছি। প্রফেসারের দাড়ি কামানো দেখছি, প্রফেসারের চিন্তাটাকে ধরবার চেষ্টা করছি, আমি তখন প্রফেসারের কোট ভেদ করে, বুকের চামড়া পাঁজর ফুঁড়ে একেবারে তার অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছিয়েছি। মানুষটাকে হাড়-চামড়া-মাংস ছাড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছি।

এ আমার ছোটবেলাকার স্বভাব।

শেষ পর্যন্ত হলো না। ছ'মাসের মধ্যে ছ'মাস ক্লাস করেই এম-এ ক্লাসে গিয়ে ভর্তি হলাম। তাই আজ আমার বড়লোক হওয়া হলো না। হিসেবের ঘরে তাই আমার আজও শূন্যই রয়ে গেল।

হিসেবের ঘরে শূন্য যাতে না থাকে সেই জন্যেই যত দুর্ভাবনা গার্জিয়ানদের। ন্যাথানিয়েল হথর্ন একজন বড় লেখক। তাঁরও মা'র ভাবনা ছিল ছেলে মানুষ হবে কি না। ছেলে ডাক্তার হবে না উকিল হবে না পাদরি হবে, না কী হলে ছেলের ভবিষ্যৎ জীবন নিষ্কণ্টক হবে, তাই নিয়েই হথর্নের মা'র দুর্ভাবনা ছিল। কী স্বদেশে কী বিদেশে কোন্ বাপ-মা আর চায় যে ছেলে লেখক হোক। ওটা আবার একটা পেশা নাকি! ওতে কি পেট ভরে? [illegible] লক্ষ-লক্ষ ছেলে লেখক হতে গিয়ে বরবাদ হয়ে গিয়েছে তার তো আর ইয়ত্তা নেই। এক লাখের মধ্যে হয়ত শেষ পর্যন্ত একটা দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু তাও যখন বয়স প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন। কম বয়েসে উপন্যাস লিখে নাম করেছে নাকি কেউ? যদিই বা হয়ে থাকে [illegible] নাম দু'দিনের। তোমার যখন বয়েস হবে তখন তোমার [illegible]লে যাবে পৃথিবী। তখন তোমাকে জনে জনে বলে বেড়াতে হবে—ওগো, এককালে আমিও লিখতুম, এককালে আমারও নাম ছিল—

হথর্নের সে-চিঠি আজো আছে। সেই তাঁর মা'কে লেখা চিঠি। তিনি লিখেছিলেন—I do not want to be a doctor and live by man's diseases; nor a minister to live by their sins; nor a lawyer and live by their quarrels. So I don't see there is anything left for me but to be an author.

সত্যিই থাকে না। এক-একজনের লেখক হওয়া ছাড়া কোনও

উপায়ই থাকে না। লিখতে না পারলে সংসারে জীব হিসেবে তারা অচল হয়ে যায়। তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু কী নিয়ে লিখবে? অত গল্প কি জীবনে কেউ অভিজ্ঞতা থেকে লিখতে পারে? নাকি অত গল্প বানানোও সহজ? গল্প কোথা থেকে পাই?

মনে আছে কতদিন মাঝ-রাত্রে ছাদের ওপর পায়চারি করে করে আকাশ-পাতাল মাথা খুঁড়েছি একটা গল্পের জন্যে। একটা গল্প দাও ভগবান, একটা গল্প দাও। সে-সব রাত্রের কথা ভাবলে গায়ে এখনও জ্বর আসে। সারা পৃথিবীতে কোথাও একটা গল্পের নাম গন্ধ নেই, অথচ আমাকে গল্প-লেখক হতেই হবে।

সে-সব দিন ছিল আমার প্রস্তুতির দিন। জানতুম না যে তখন আমার মনের মধ্যেই গল্পের রান্না চলেছে। পরিবেশন-[illegible] করতে হলে খাদ্যকে যথোপযুক্ত সময় দিয়ে সুসিদ্ধ করতে হবে। গল্প তো চোখের সামনে দিবারাত্রই ঘটে চলেছে। রাস্তায়, ঘরে, বাসে, ট্রেনে, ট্রামে, প্লেনে সর্বত্র। আমাদের চোখের সামনে, আমাদের চোখের আড়ালে গল্প তার নিজের নিয়[illegible] চলেছে। কেউ দেখতে পেলেও ঘটে চলেছে, কেউ দেখতে [illegible]লেও ঘটে চলেছে। তবে খুঁজে নিতে হবে। খুঁজে নিতে জানা চাই। রন্ধন বিশারদরা যেমন জানে কোন্ মশলার সঙ্গে কোন্ মশলার মিশ্রণ ঘটালে কোন্ খাদ্য উপাদেয় হবে, গল্প-লেখকরাও তেমনি জানে কোন্ ঘটনার কতটুকু নিয়ে তার সঙ্গে অন্য কোন্ ঘটনার কতটুকু জুড়ে দিলে কোন্ গল্প সাহিত্য হয়ে উঠবে।

আর দর্শন?

সে তো পরের কথা! আসলে দৃষ্টিই তো দর্শন! জীবনকে গল্পের মাধ্যমে টলস্টয় যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, সেইটেই টলস্টয়ের দর্শন। এমনি করে পৃথিবীর সমস্ত লেখকেরই একটা বিশেষ

দৃষ্টিভঙ্গি আছে। দৃষ্টির গভীরতা দিয়ে সাহিত্যের গভীরতার বিচার হয়ে থাকে। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার জোরকে জীবনেরও একটা সঠিক চেহারা ধরা পড়ে লেখকের চোখে। তখন সেই চোখ দিয়েই সে জীবন খোঁজে। কিছু না-খুঁজতেই আসে, কিছু আবার খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে গেলেও আসে না। হাজার হাজার পাতার বই খুঁজলেও অনেক সময় পাওয়া যায় না, আবার হঠাৎ হয়ত বহুবার বহুবছর ধরে দেখা নিজের বাড়ির সামনের ল্যাম্প্‌পোস্টটাই নতুন একটা গল্প হয়ে উঠলো। ক্যাস্পিয়ান সাগরে যাইনি কখনও, কিন্তু এমনও হতে পারে বাড়ির পেছনের পানা-পুকুরটাই হয়ত প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়েও রহস্যময় হয়ে উঠলো।

সারা জীবন ধরে এমনি অনেক ঘটনা চোখে পড়েছে; তার [illegible]কিছু লিখেছি, আবার কিছু লিখিনি। কিছু সময়ের অভাবে লিখিনি, আবার কিছু লেখবার মত নয় বলেও লিখিনি। কোন্‌টা লেখবার মত আর কোন্‌টা না-লেখবার মত তার বিচার করবে লেখ[illegible] সে-বিচার অনেক সময় সময়-সাপেক্ষ, কখনও তা মনে পুষে রে[illegible]দই, আবার কখনও তা ভুলেও যাই। তারপর হঠাৎ এ[illegible]তর সিন্দুক খুলে তাদের নাড়া-চাড়া করতে করতে তারা জেগে ওঠে, চোখ মেলে, কথা বলে। তখন তারা খাতার পাতায় লোকচক্ষুর সামনে বেরিয়ে আসে। ছাপার অক্ষরে বই হয়ে বেরোয়।

এমনি একটা ঘটনার কথা আজ বলি। এটা নাগপুরের এয়ার-পোর্ট থেকে পাওয়া।

এটা আমার শোনা গল্প। সম্প্রতি বোম্বাই যেতে হয়েছিল। যাবার সময় প্লেনের ভেতর কিছুই তেমন ঘটেনি। অর্থাৎ যথা সময়ে উড়তে শুরু করেছিলাম এবং যথা সময়েই গন্তব্যস্থলে নেমে-

ছিলাম। ভেবেছিলাম এ-যাত্রাটা ব্যর্থ হলো। চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যদি উল্লেখযোগ্য কিছু না দেখতে পেলাম তো সমস্ত পরিশ্রম-টাই যে বাজে খরচ। অথচ এবার ভাড়া বেশি দিতে হয়েছে। কারণ এবার আর ভাইকাউন্ট প্লেন্ নয়—এবার সুপার কন্স্টেলেশন্। এতে ভিড় বেশি। শীতের মরশুম। যত রাজ্যের ফরেনার ভর্তি। সব ইণ্ডিয়া দেখতে বেরিয়েছে। রোম, বার্লিন, টোকিও, সিঙ্গাপুর, ইণ্ডিয়া দেখে বাড়ি ফিরবে। লাল লাল মুখ সব। কেউ জার্মান, কেউ সুইশ, কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ আরবী, কেউ জাপানীজ্। তাদের কারো সঙ্গেই ভাব জম্লো না। সবাই কেমন যেন নিজের নিজের দল নিয়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত। আমার মত একক নয় কেউ।

সুতরাং সমস্ত রাস্তাটা চুপচাপ সিগারেট পোড়াতে-পোড়া[illegible] দিন শেষ হয়ে গেল।

যখন সান্তাক্রুজে নামলুম—তখনও বিশ্বাস ছিল একটা-না-একটা গল্প পেয়ে যাবোই। কিন্তু কোথায় কী? একেবারে বাজে খরচই হলো পয়সাটা, বুঝতে পারলুম।

আসলে আমি যখন যেখানেই থাকি, একটা [illegible]র মাল-মশলা খুঁজে বেড়াই। এটা আমার ছোট বেলাকার স্বভাব। যখন গল্প লেখা পেশা হয়নি, তখন থেকেই। ঘরে বাইরে, রাস্তায়, ট্রেনে, ট্রামে, বাসে সর্বত্র। চোখের সামনে একটা দুর্ঘটনা ঘটলেও যেন মনে মনে একটু তৃপ্তি পাই। আর আমার কাছে ঘটনা বা দুর্ঘটনার মধ্যে কোনও তফাৎই নেই। যতক্ষণ জেগে থাকি, ততক্ষণ চোখ বুঁজে থাকতে পারি না। মনে হয় জগতের অনেক কিছু আনন্দ থেকেই যেন বঞ্চিত হলাম। অনেক কিছু আশ্চর্য জিনিষ যেন না-দেখা রয়ে গেল আমার।

কিন্তু আমার আশা মিটলো ফেরবার পথে।

ফেরবার পথে কিছুতেই আর দিনের বেলার টিকিট্ পাওয়া

গেল না। দিনের আলোয় ফেরার জন্যে অপেক্ষা করতে হলে আরো সাত দিন নষ্ট করতে হয়। তার চেয়ে রাত্রের প্লেনটা ভালো। না-হয় চোখ বুঁজেই কাটাবো। না-হয় কিছু ঘটনা দেখতেই পাবো না। না-হয় আরো কিছু ঘণ্টা নষ্টই হবে। তার চেয়ে আরো বেশি লাভ ক'দিন আগে কলকাতায় ফিরতে পাবলে!

তা শেষ পর্যন্ত নাইট্-প্লেনেই এলাম। রাত সাড়ে এগারোটার সময় ছাড়লাম সান্তাক্রুজ্। ছোট প্লেন্। স্কাই-মাস্টাব। এতে প্যাসেঞ্জাব কম। ভাড়াও কম। অবশ্য সময় লাগে বেশি। বুঝলাম আর একটা রাত জেগেই কাটবে। তাতেও আমার কোনও দুঃখ ছিল না, যদি একটা গল্প পেতাম। প্লেন ছাড়তেই সবাই ভালো [illegible] হেলান্ দিয়ে চোখ বুঁজে ঘুমের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। [illegible] পেছনের সীটে মাঝে-মাঝে মেয়েলি গলার হাসির শব্দ হচ্ছিল। ফিরে দেখলাম এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী। খুব বয়েস হয়েছে। কান পেতে রইলাম। ভাষা বুঝতে পারি কিনা কি[illegible] না—[illegible]র গ্রীক্। একটা বর্ণও বুঝতে পারলাম না। রাত দে[illegible] প্লেন্ এসে নামলো নাগপুর এয়ার-পোর্টে।

সব প্যাসেঞ্জারের হাতে একটা করে ব্রেক্‌ফাস্টের টিকিট দিয়ে গেল এয়ার হোস্টেস্। সেই টিকিটখানা গিয়ে দেখালাম এয়ার পোর্টের রেস্টুরেন্টে। চা এল, ডিম্ এল, টোস্ট্ এল। সেই অচেনা ভিড়ের মধ্যে বসে রাত দেড়টার সময় হলো আমাদের ব্রেক্‌ফাস্ট্।

তা খাবার টেবিলে বসেও এদিকে-ওদিক চাইলাম। যে-যার সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। সবাই সাহেবী পোশাক পরেছে। ধুতি-পাঞ্জাবী একমাত্র আমারই। হংস-মধ্যে একলা আমিই শুধু বক্। নাগপুর এয়ার-পোর্ট এক অদ্ভুত জায়গা। ইণ্ডিয়াতে এমন অদ্ভুত জায়গা আছে বলে আগে জানতাম না। চারিদিকে মনো-যোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম। কলকাতা থেকে এসেছে ম্যাড্রাসের

যাত্রীরা। এখানে প্লেন্-বদল করে ম্যাড্রাসে যাবে। এসেছে দিল্লীর যাত্রীরা। দিল্লী থেকে এসে যাবে বোম্বাই। দিল্লী-বোম্বাই-মাদ্রাজ-কলকাতা—সব প্যাসেঞ্জারের সঙ্গম-স্থল এই নাগপুর এয়ার পোর্ট। কারো প্লেন ছাড়বে রাত তিনটেয়। কারো সাড়ে তিনটেয়। কারো-চারটেয়। কারো বা ভোর ছ'টায়। সবাই লাউঞ্জে বসে ঢুলছে, গল্প করছে। এত বড় এয়ার-পোর্টের মধ্যে একটা বসবার মত জায়গাও খালি নেই।

রাত তিনটে পর্যন্ত পায়চারি করেই কাটাতে হলো।

শেষকালে শেষ প্লেনটা ছাড়তেই কিছু খালি জায়গা। আমি গিয়ে হেলান দিলুম একটা সোফায়। শীতের মাঝ-রাত। তার ওপর কন্‌কনে শীত। সামনেই একটা জায়গায় কী যেন সিনেমা [illegible]দিন দেখানো হচ্ছিল প্যাসেঞ্জারদের জন্যে। কিন্তু ক্লান্তিতে [illegible] আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন।

হঠাৎ পাশের এক ভদ্রলোক নড়ে উঠলেন। এতক্ষণ তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন—আপনি [illegible] কোথায় যাচ্ছেন?

বেশ স্পষ্ট সোজা বাঙলা ভাষা! চেয়ে দেখলাম আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া। এতক্ষণ চেনাই যায়নি। এত অসংখ্য বিদেশীর ভিড়ের মধ্যে যেন একটু নিবিড়তার স্পর্শ পেলাম বাঙলা কথা শুনে।

বললেন—আমি বার্মা-শেলের য়্যাসিস্টেন্ট, যাচ্ছি বোম্বে—

বললাম—আপনিও কি একলা? সঙ্গে বুঝি কেউ নেই আমারই মতন?

আলাপ হলো—ঘুম উড়ে গেল তাঁর। বললেন—অনেকক্ষণ একলা বসে থেকে থেকে একটু চোখ বুঁজিয়েছিলাম, প্লেন্ তো আমার সেই সাড়ে-চারটের সময়—

তারপর যা হয়। পরস্পর পরিচয় আদান-প্রদান হলো। ভদ্রলোকের নাম মিস্টার মুখার্জী। ডিউটিতে এসেছিলেন কলকাতায়। ডিউটিও বটে আবার ফ্যামিলি দেখা-শোনাও বটে। কাম্বালা-হিলে কোম্পানীর কোয়ার্টার আছে। সেখানেই থাকেন।

—আর আপনি?

আমার আর কী পরিচয় দেব! বললাম—আপনাদের মতন চাকরি বাকরি করবার সৌভাগ্য হয়নি, এই যা কিছু দেখি শুনি তাই লিখি, লেখাই আমার পেশা।

হঠাৎ ভদ্রলোক যেন আরো সজাগ হলেন এবার। ভালো [illegible] আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। এত আজব-[illegible]ষ থাকতে আমাকেই যেন এক আজব জীব বলে ঠাওরালেন। যেন প্রথমে বিশ্বাস হলো না। বললেন—কী লেখেন?

যা যা লিখি বললাম।

[illegible] হলেন। বললেন—আমি মশাই লেখক কখন দেখি[illegible]বেলায় লেখা টেখা পড়েছি। শরৎ চাটুজ্যের পর আর [illegible] জন্মেছে নাকি?

তিনি যে যুগের মানুষ তাতে তাঁর কথায় আমার অভিমান করার কিছু ছিল না। বরং ভালোই লাগলো জেনে। অন্ততঃ মন খুলে কথা বলা যাবে। পাঠকের সামনে আড়ষ্ট হয়ে থাকবার দুর্ভোগ ভুগতে হবে না।

মিস্টার মুখার্জী বললেন—গল্প আপনারা কী করে লেখেন?

বললাম—বানিয়ে বানিয়ে—

মিস্টার মুখার্জী বললেন—কিন্তু কখনও কখনও কি এমনি গল্প পেয়ে যান না?

বললাম—তাও পাই—। পাথর থেকে যেমন মূর্তি তৈরি

করে শিল্পীরা, তেমনি শুনে, দেখে, লোকের সঙ্গে মিশে, কল্পনা করে আমরাও গল্প তৈরি করি—

—কিন্তু কখনও তৈরি রেডিমেড গল্প পান না ?

বললাম—সে খুব কম—

মিস্টার মুখার্জী বললেন—তাহলে একটা রেডি-মেড গল্প যদি আপনাকে দিই, আপনি শুনবেন ?

বললাম—গল্প শোনা আর গল্প লেখাই তো আমার পেশা, শুনবো না কেন ?

—তাহলে চলুন, এক কাপ কফি খাই গিয়ে, বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে—

এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে জীবনে। কিন্তু এ-ও জান[illegible] এত আশা করা ভাল নয়। এমন ভাবে বহুবারই ঠকতে [illegible]দিন হাজার-হাজার কাহিনী শুনেছি জীবনে, হাজার-হাজার রাত [illegible] দিয়ে কাটিয়েছি, শুধু গল্পের সন্ধানে। অপব্যয় আর অত্যাচারের চূড়ান্ত করেছি। শরীর-মন ধ্বংস হয়েছে। অ[illegible]য়ে[illegible]আবার অনেক পাইওনি। কিন্তু পাওয়ার গৌরবে [illegible]না-পাওয়ার দুঃখ ধুয়ে-মুছে গেছে। কিন্তু তবু হতাশ হইনি [illegible]ও। হতাশ হতে নেই। হতাশ হওয়া লেখকদের নিষেধ।

—তবে শুনুন।

মিস্টার মুখার্জী কফির টেবিলে বসে সিগারেট ধরালেন। বললেন—আপনাকে একটা রেডি-মেড গল্প দিই। আমি মশাই, সিনেমার লোকও নই, সাহিত্যের লোকও নই। আমি পেট্রোল নিয়ে কারবার করি। তেলটা বুঝি। আমার বুড়ো বাপ-মা থাকে কলকাতাতে, আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সেই জন্যে বেশির ভাগ সময়ে সেখানে থাকে। আমিও কলকাতাতে ছিলুম, এক বছর হলো বোম্বেতে এসেছি বদলি হয়ে। আমাদের বার্মা-শেলের

হেড-অফিস বোম্বেতে, আপনি বোধহয় জানেন। ভালো কোয়ার্টার পেয়েছি। একলা থাকি সেখানে। আমার চাকর আছে, ঝি আছে, সব কিছু আছে। কোনও কষ্টই নেই বলতে গেলে—এই অবস্থায় আমার কোয়ার্টাবেই একটা গল্পের মত ঘটনা ঘটে গেল—

—আপনার কোয়ার্টারেই ?

মিস্টার মুখার্জী বললেন—হ্যাঁ আমার কোয়ার্টারেই। আমার কোয়ার্টারটা বড়। চারখানা বড় বড় রুম। জানালা দিয়ে দূর আরেবিয়ান সমুদ্র দেখা যায়। বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলাম। হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল একদিন।

[illegible] দিন বাড়িতে বসে আছি। সেদিন রবিবার। হঠাৎ [illegible] বেয়ারা এসে বললে—একজন মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—

আমি তো শুনে অবাক। আমার সঙ্গে মেয়েমানুষ কে এসে দেখা করবে [illegible]

বল[illegible]দে, এ-বাড়িতে কেউ মেয়েমানুষ নেই—

চাকরটা বললে—না, আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চায়—

তবু বুঝতে পারলাম না আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন ? তখন সকালবেলা। খবরের কাগজ পড়ছিলাম। কারোর সঙ্গে দেখা করবার মেজাজও ছিল না। তাছাড়া তখন সময়ও ছিল না। আর একটু পরেই অফিসে যেতে হবে। তা যাহোক, শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম।

আমার চাকর কৃষ্ণান্ দরজা খুলে দিয়ে মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে এল।

দেখলাম সাধারণ পাঁচ-পাঁচি একটা মেয়ে। কত আর বয়েস হবে ! কুড়ি কি একুশ বছর ? সাধারণ একটা ছাপা শাড়ি পরা।

একগাছি করে সোনার চুড়ি ছ'হাতে। চোখে-মুখে একটু ভয়-ভয় ভাব। ঘরের মধ্যে ঢুকে যেন বড় আড়ষ্ট বোধ করছিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাত-জোড় করে নমস্কার করলে। ভাবলাম হয়ত কিছু সাহায্য চাইতে এসেছে। কত লোকই তো বিপদে পড়ে আমার কাছে আসে। বাঙালী শুনে হয়ত তাই কিছু অর্থ-সাহায্য নিতে এসেছে সেই রকম।
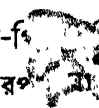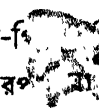
জিজ্ঞেস করলাম—কী দরকার বলুন ?

মেয়েটি বললে—আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে পড়ে এসেছি, যদি উপকার করেন—

বললাম—বলুন, কী উপকার আপনি চান ?

মেয়েটি বললে—আপনার লেটার-বক্সটা যদি আমায় [illegible] দিন ব্যবহার করতে দেন—

—আমার লেটার-বক্স ?

আমি কিছু বুঝতে পারলুম না। আমার লেটার-বক্সটা ফ্ল্যাটের বাইরে তালা-চাবি বন্ধ করা থাকে। পোস্ট্যাল-পি[illegible]তে এসে তার ভেতরে চিঠি ফেলে দিয়ে যায় রোজ। তারপ[illegible] তালা-চাবি খুলে চিঠিগুলো বার করে নিয়ে আসে।

বললাম—আমার লেটার-বক্সে তো আমার নিজেরই চিঠি আসে, সেটা আপনাকে আমি কি করে দেব ?

মেয়েটি বললে—আমাকে লেটার-বক্সটা শুধু ব্যবহার করতে দেবেন—

—তার মানে ?

মেয়েটি বুঝিয়ে বললে তখন—তার মানে আমার চিঠিপত্র যদি আপনার ঠিকানায় আসে তো আপনার কিছু আপত্তি আছে ?

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। মেয়েটির চিঠি আমার লেটার-বক্সে আসবে !

জিজ্ঞেস করলাম—কেন ? আপনার নিজের লেটার-বক্স নেই ? আপনার চিঠি তো আপনার ঠিকানাতেই আসা উচিত ?

মেয়েটি বললে—আমার বাড়িতে চিঠি আসার অনেক অসুবিধে—

—কী অসুবিধে ?

মেয়েটি উত্তর দিতে যেন আর একটু দ্বিধা করতে লাগলো। তারপর বললে--আমি যেখানে থাকি সেটা ভাল জায়গা নয়, আমার চিঠি সেখানে ঠিকমত পৌঁছোবে না—

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম শুনে।

জিজ্ঞেস করলাম—পৌঁছোবে না মানে ? কোথায় থাকেন [illegible]নি ?

[illegible]য়েটি বললে—একটি বস্তিতে—

বস্তি শুনে আরো কৌতূহল হলো আমার। জিজ্ঞেস করলাম—কোন্ বস্তিতে ?

[illegible]া—সে আপনি চিনবেন না—প্যারেলের কাছে—

[illegible]রেলে পোস্ট্যাল পিওন যায় না, কে বল[illegible] তোমায় ?

মেয়েটি যেন বড় মুশকিলে পড়লো বুঝতে পারলাম। খানিক ভেবে বললে—পিওন গেলেও চিঠি পাবার কোনও সুবিধে নেই। আমার চিঠি সবাই পড়ে ফেলে, ঠিক সময় হাতে আসে না—

বললাম—কিন্তু সেখান থেকে এতদূরে এইখানে আমার বাড়ি থেকে চিঠি নিতে আসবে তুমি ?

মেয়েটি বললে—তা আসবো।

—কিন্তু এতদূরে এসে চিঠি নেবার কষ্টটা কেন করবে তুমি বুঝতে পারছি না।

মেয়েটি বললে—এদিকে তো আমাকে আসতেই হয় রোজ, সুতরাং আমার পক্ষে কিছু কষ্ট নয়—

—এদিকে কী করতে আসো?

মেয়েটি বললে—আমি মালাবার হিলে একটা মেয়েকে ইংরিজী পড়াই। ছোট্ট মেয়ে।

—তুমি ভালো ইংরিজী জানো?

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, আমি কলকাতায় কন্‌ভেণ্টে পড়েছি, ইংরিজীটা আমি ভালো বলতে পারি—

—কার বাড়িতে পড়াও?

—মিস্টার দেশমুখের বাড়ি।

—তা তাঁর ঠিকানায় তোমার চিঠি আনাও না কেন?

মেয়েটি বললে—আপনি বাঙালী। কলকাতায় [illegible]দিন আত্মীয়-স্বজন যদি জানতে পারেন যে আমি মারাঠিদের বা[illegible] [illegible]ছি, তাহলে তাঁরা কিছু মনে করতে পারেন, বাঙালীর ঠিকানা [illegible]লে কোনও বদনাম রটবে না। তাই আপনার কাছে এ[illegible]—

এ বড় অদ্ভুত আবদার তো! আমি কী বলবে[illegible] [illegible]ম না।

মেয়েটি আবার বলতে লাগলো—তাছাড়া আমি আপনার কোনও অসুবিধে করবো না। আমি শুধু মাঝে-মাঝে এসে খোঁজ নিয়ে যাবো আমার নামে কোনও চিঠি আছে কি না, তাতে আশা করি আপনার কোনও অসুবিধে হবে না—

তখন আমার অফিস যাবার তাড়া ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম,—কবে চিঠি আসবে?

মেয়েটি বললে—তার কোনও ঠিক নেই। আপনার পারমিশন পেলে তবে আমি আপনার ঠিকানায় তাদের চিঠি দিতে বলবো—

—কলকাতায় তোমার কে-কে আছে?

মেয়েটি বললে—আমার এক ছোট নাবালক ভাই আছে, আর বিধবা মা। এখান থেকে টাকা পাঠালে তবে তাদের স্কুলের-ফিস্, সংসার-খবচ, বাড়ি-ভাড়া, সব কিছু চলে –

—তাদের এখানে নিয়ে আসো না কেন? সবাই মিলে এখানেই থাকবে।

মেয়েটি বললে--এইবার আনবো। আমার ভাই ম্যাট্রিক পাশ করলেই এখানে নিয়ে চলে আসবো—আব এক বছব পরেই চলে আসবে তাবা, ততদিন শুধু আপনার লেটার-বক্সটা ব্যবহার করতে দিন দয়া করে—

আমি অনেকক্ষণ ভাবলাম। তখনও আমার সন্দেহ যেন ঘোচেনি।

[illegible]পর আবার জিজ্ঞেস কবলাম—আচ্ছা, একটা কথা, তুমি [illegible]ইকে বেখে বোম্বেতে এলে কী কবে? কে তোমাকে বোম্বেতে নিয়ে এল?

[illegible]টি বললে—আমাব এক মামা ছিলেন এখানে, তি[illegible] [illegible] চাকরি করতেন। তিনি হঠাৎ মাবা যেতেই স[illegible] গোল[illegible]গল। মামীমা, মামাতো ভাই, সকলকে রেলের কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হলো, সবাই চলে গেল তখন দেশে ফিরে, কেবল আমি রয়ে গেলাম—

তখন অতো কথা শোনবাব আর সময় ছিল না আমার। সামান্য লেটাব-বক্সটা ব্যবহার করলে কী আর আমার এমন ক্ষতি! রাজী হয়ে গেলাম।

বললাম—আচ্ছা যাও, যখন চিঠি আসবে তোমার নামে আমি রেখে দেব সে-চিঠি--

মেয়েটি বললে—আমার নামটা জিজ্ঞেস করবেন না?

বললাম—বলো—

মেয়েটি বললে—আমার নাম সুমিতা মুখার্জী। আপনার কেয়ারেই চিঠি আসবে—

কথাটা বলে মেয়েটি চলে গেল। আমিও সেদিন আর সময় নষ্ট না করে অফিস যাবার জন্মে তৈরি হতে গেলাম।

তা এই হলো সূত্রপাত মশাই। কোথাকার কোন্ সুমিতা মুখার্জী, বাপের জন্মেও কখনও তার নাম শুনিনি। দেখিওনি। ঘটনাচক্রে এইভাবে প্রথম মেয়েটিকে দেখেছিলুম। তারপর যে শেষ পর্যন্ত অমন হবে ভাবতেও পারিনি।

কফিতে আর এক চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—শেষ পর্যন্ত কী হলো ?

মিস্টার মুখার্জী বলতে লাগলেন—ছোটবেলায় যখন গল্প উপন্যাস পড়তুম, তখন মনে হতো এ-সব বানানো আজ[illegible] [illegible]দিন লেখকরা গাঁজায় দম দিয়ে আমাদের মন ভোলাবার চেষ্টা [illegible] [illegible]তারপর বয়েস হয়েছে। গল্প-টল্প পড়া ছেড়ে দিয়েছি। এখন [illegible]র ওসব পাটই নেই। এই বুড়ো বয়েসে যে আমার কোয়ার্টারের মধ্যেই গল্প তৈরি হবে তা কে জানতো ? আ[illegible] [illegible]ম। একেবারে ঠিক বানানো গল্পের মতন। তবে আ[illegible] [illegible], তার এক বর্ণও আজগুবি নয়, বানানো নয়। একেবারে সত্যি ঘটনা।

লাউঞ্জে তখন সিনেমা-শো ভেঙে গেছে। চায়ের টেবিলেও তখন ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। একে-একে সবাই সোফার ওপর গা ঢালবার চেষ্টা করছে। নাগপুরের টেম্পারেচার অনেক ডিগ্রী নিচেয় নেমে এসেছে। জিরো ছোঁয়-ছোঁয়। বাইরে ল্যাণ্ডিং-গ্রাউণ্ডের তীব্র আলো কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। বাইরে হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। আমরা গুটি-সুটি হয়ে আরো দু'কাপ কফির অর্ডার দিলুম।

মিস্টার মুখার্জী বললেন—তারপর আমি অফিসে চলে গেলুম

আর অফিসে গেলে যা হয়, আমি সব কথা ভুলেই গেলাম বলতে গেলে। তারপর বাড়ি ফিরে এসে আর কিছু মনে রইল না। প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে উঠে একবার খবরের কাগজটা দেখা আর তার পরই সংসারের জীবিকার সমুদ্রে ডুব দেওয়া। পৃথিবীর সব মানুষের এই তো দৈনন্দিন রুটিন। এই রুটিন মেনেই সারা পৃথিবীর লোক চলছে। আসলে জীবিকার জন্যেই আমরা বেঁচে আছি। বাঁচার জন্যে আর আমাদের জীবিকা নয়। আমরা আজকের পৃথিবীর সব মানুষ সব জিনিষের দাম জানি, কিন্তু কোনও জিনিষের মূল্য দিতে চাই না। আমার তো মনে হয় এইটেই এ-যুগের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। আপনি কী বলেন?

আমি বললাম—কিন্তু তারপর? তারপর সেই মেয়েটি আর

[illegible]স্টার মুখার্জী বললেন—এসেছিল বৈ কি। না এলে গল্প হবে কী করে? গল্প হবে কাকে নিয়ে? দিন পনেরো পরে একদিন আমার কৃষ্ণান যথারীতি কয়েকটা চিঠি লেটার-বক্স থেকে আ[illegible]য় এল। যেমন সব আজে-বাজে চিঠি। কোনওটা ইনসি[illegible]সর চিঠি, কোনওটা দর্জির বিল, কোনওটা ইনকামট্যাক্স অফিসের, কোনওটা জামা-কাপড়ের দোকানের। আমার স্ত্রীর চিঠিও ছিল। কিন্তু আর একটা চিঠিও ছিল সেই সঙ্গে। সুমিতা মুখার্জীর চিঠি। মিসেস সুমিতা মুখার্জী নাম লেখা ওপরে। আমার কেয়ার-অফে খামে মোড়া চিঠি। চিঠিখানা বেশ মোটা। দেখে মনে হলো—ভেতরে যেন অনেক কথা লেখা আছে।

একবার লোভ হলো, কী কথা আছে ভেতরে খুলে দেখি। আবার না-হয় ভালো করে এঁটে দেব। কিন্তু আবার ভাবলাম, মা হয়ত মেয়েকে সাংসারিক কথা লিখেছে, যা আমার দেখা উচিত নয়। গরীব সংসারের খুঁটিনাটি, যা সব ফ্যামিলিতেই ঘটে।

মেয়েকে হয়ত উপদেশ দিয়েছে মা। হয়ত সাবধান করে দিয়েছে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। হয়ত বলেছে আরো কিছু টাকা পাঠাতে। কিংবা সামনেই হয়ত ভাই-এর স্কুলের পরীক্ষা, তার ফিস্ জমা দিতে হবে। অথবা বাড়িওয়ালা বাড়ি-ভাড়ার তাগাদা করছে। তার অনেক টাকা বাকি পড়ে আছে। সেগুলো তাড়াতাড়ি শোধ করতে হবে। নইলে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে! এমনি অসংখ্য সব সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে সুমিতা হয়ত এই বোম্বাই সহরে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

তা যা হোক। চিঠিটা আমার কাছেই রেখে দিলুম। কৃষ্ণানকে বললাম—যদি সেই মহিলাটি আসে তো তাকে যেন তার এই চিঠিটা দিয়ে দেওয়া হয়।

কথাটা বলে আমি আবার অফিসে চলে গেলাম। [illegible]দিন

তার একদিন পরে আবার মেয়েটি হঠাৎ এল। কৃষ্ণান্ [illegible] [illegible]মার কাছে নিয়ে এল। মেয়েটি বললে—শুনলাম আমার চিঠি [illegible]ছে—?

বললাম—হ্যাঁ, তোমার চিঠি আমি রেখে দিয়ে[illegible], এ[illegible]—

মেয়েটি চিঠি নিলে। তারপর বললে—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ—

বললাম—আমাকে আর ধন্যবাদ দিতে হবে না—

মেয়েটি বললে—না, আপনি আমাকে আপনার লেটার-বক্সটা ব্যবহার করতে দিয়ে আমার অনেক উপকার করেছেন, এজন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ—

বললাম—আমার তো তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি, তোমার উপকার হলেই হলো—

এরপর মেয়েটি আমাকে খুব ভক্তিভরে নমস্কার করে চলে যাচ্ছিল। আমার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো।

বললাম—আচ্ছা, শোন একটা কথা ছিল—

মেয়েটি ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—কী, বলুন ?

জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, তোমার নামতো সুমিতা মুখার্জী, কিন্তু নামের আগে 'মিসেস' কথাটা লেখা কেন ? তোমার কী বিয়ে হয়ে গিয়েছে ?

মেয়েটি যেন হঠাৎ আমার কথা শুনে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেলো একটু।

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম—অবশ্য আমার এ-রকম কৌতূহল হওয়া উচিত নয়। তোমাকে দেখে আমার কিন্তু মনে [illegible]য়েছিল তোমার এখনও বিয়েই হয়নি—। আর তোমার সিঁথিতে [illegible] নেই কিনা—

[illegible]ট তখনও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

[illegible]ার লজ্জায় ফেলা উচিত নয় মনে হলো আমার। মেয়েটির পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমার কোনও কৌতূহল প্রকাশ ক[illegible] অ[illegible] [illegible]ক্ষে।

[illegible]মরা ক্রিশ্চান বুঝি ?

মেয়েটির মাথা এবার আরো নিচু হয়ে গেল।

বললে—না, আমি বিধবা।

আমি হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়লাম। এটা সত্যিই আশা করিনি। কিন্তু যা বলে ফেলেছি, তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। অনেকক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। মেয়েটিও কিছু কথা বলতে পারলে না।

শেষকালে আমি বললাম—আচ্ছা এখন তুমি এসো -

মেয়েটি খানিক পরে মুখ তুললে। বললে—না, এ-কথাট আগে আপনাকে আমার বলা উচিত ছিল। আপনাকে যখন সব বলেছি তখন এটা না বলা আমারই অন্যায় হয়েছে—

বললাম—না, না, কোনও অন্যায় হয়নি তোমার, এটা তো আর বলার জিনিষ নয়—

মেয়েটি আমার কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলো—না, যখন সবই বলেছি, এটাও বলা উচিত ছিল, তা না হলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন কেন? খুব কম বয়েসেই আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আমার যখন বয়েস বারো বছর। বিয়ের এক বছর পরেই আমার স্বামী মারা যান। সেই জন্যেই আমি এইভাবে চাকরি করতে বেরিয়েছি। বিধবা হবার পর আমি লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করি। কনভেন্টের এক সিস্টারের আমার ওপর দয়া হওয়াতে আমাকে বিনা-পয়সায় লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করেছিলেন—

আমি চুপ করে শুনছিলাম। এ-সব কথার কী [illegible] দি[illegible] দেব?

[illegible]মেয়েটি আবার বলতে লাগলো—শেষ পর্যন্ত তারা আম[illegible] [illegible]চান করতেই চেয়েছিল, হয়ত ক্রিশ্চান হলে তারাই আমাকে [illegible] কিছু চাকরি করে দিত। তাহলে আর [illegible] [illegible] [illegible] বিদেশে মা-ভাইকে দূরে রেখে চাকরি করতে আস[illegible] তো [illegible]না—

জিজ্ঞেস করলাম—কিছু যদি না মনে করো তো একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—বলুন?

—কত উপায় হয় তোমার এখানে?

মেয়েটি বললে—সব মিলিয়ে আড়াই শো টাকার মতন। তার মধ্যে দেড় শো টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিই মা'র কাছে মানি অর্ডার করে, আর আমি নিজের হাতে রাখি একশো টাকা—

জিজ্ঞেস করলাম—একশো টাকায় তোমার চলে?

মেয়েটি করুণ হয়ে উঠলো বড়।

বললে—চালাতে হয় কোনও রকমে। বলতে গেলে চলেই না। নিজের হাতে সাবান-কাচা করি, নিজের হাতে রান্না করি, নিজেই ঘর ঝাঁট দিই, বাসন মাজি। সেই করেই কোনও রকমে এই ক'দিন চালিয়ে যাচ্ছি। মামা মারা যাওয়ার পর থেকে বড় কষ্টে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। তাছাড়া আমি পুরুষ মানুষ হলে এত কষ্ট হতো না। একে বাঙালী, তার ওপর বিধবা, আমার দুঃখ মারাঠি-গুজরাটিরা ঠিক বুঝতে পারবে না—

বললাম—চাকরি একটা তুমি করবে? আমাদের অফিসে চেষ্টা করবো তোমার জন্যে?

মেয়েটি বললে—আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাই না আমি। আ[illegible] [illegible]লেটার-বক্স ব্যবহার করতে দিয়ে আমার ওপর আপনি [illegible]গ্রহ দেখিয়েছেন—

[illegible]ললাম—না না, এ তো সামান্য জিনিষ, এ আর এম[illegible]কি? তুমি যদি বলো তোমার ট্যুইশানি করেও দিনের বেলা আম[illegible] [illegible] [illegible]াকরি করতে পারো। তুমি স্টেনোগ্রাফি জানো?

[illegible]টি মাথা নাড়লে। বললে—না—

বললাম—শিখে নাও না—

মেয়েটি বললে—শিখতে গেলেও তো কিছুদিন সময় লাগবে আর শেখবার টাকা কোথায় পাবো? সে-টাকাটা বরং মাকে পাঠালে তারা খেয়ে পরে বাঁচবে—

—যদি আমি টাকা দিই?

মেয়েটি হঠাৎ মুখ তুলে চাইলে আমার দিকে। যেন থরথ[illegible] করে কাঁপতে লাগলো। বললে—না আমায় মাপ করবেন, আমা[illegible] দুঃখ-কষ্ট-অভাব নিয়ে আপনাকে আর বিব্রত করতে চাই না—

বললাম—দশ-পনেরো টাকা যা লাগে তা দেবার ক্ষমতা আমা[illegible] আছে, আমি তাতে গরীব হয়ে যাবো না—

মেয়েটি বললে—না থাক, আমাকে আপনি লোভ দেখাবেন না—আমি আসি—বলে তাড়াতাড়ি আমাকে নমস্কার করে চলে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

—তারপর সেদিন মেয়েটির কথা নিয়ে একটু ভাবতে লাগলাম। প্রথম দিন অতটা কিছু মনে হয়নি। বোম্বাই সহরে কে কার ধার ধাবে মশাই ? সবাই নিজের-নিজের তালে ঘুরছে। টাকাই কেবল একমাত্র ফ্যাক্টর। টাকা উপায় করতে এসেছে গুজ[illegible] টাকা উপায় করতে এসেছে মুসলমানরা। ভোরা মুসলমা[illegible] [illegible]দিন ‍উপায় করছে পার্শীরা, করছে মারাঠিরা। টাকার জন্যে প[illegible] [illegible]কত দূর দেশ থেকে এসেছে সিন্ধিরা। আর আমি ? [illegible]লী হলেও টাকা উপায় করতেই তো এসেছি ! নইলে কিসের [illegible]বাংলাদেশ ছেড়ে এই পশ্চিম-ঘাটে আসবো ? [illegible] [illegible]নেই টাকা। টাকা ছাড়া এখানে অন্য কোনও প্রসঙ্গই [illegible] অন্য কানও চিন্তাই নেই। এক মিনিট সময় মানে ব্যবসাদারদের কাছে এক হাজার টাকা। টাকাই বোম্বের জপ, তপ, ধ্যান, জ্ঞান, মোক্ষ—সব কিছু। তাই প্রথম দিন চাকরির চক্রে একটু ভুলেই ছিলাম। কিন্তু বাঙালী হয়ে তো এখনও ওদের মত টাকার ভক্ত হয়ে উঠতে পারিনি ? তাই অফিসে যাবার পথে মেয়েটার কথা একটু-একটু মনে পড়তে লাগলো।

কিন্তু ওই পর্যন্তই !

তারপর দিন থেকে আবার যেমন-কে-তেমন। আবার সেই চাকরি, আবার সেই চক্র। সেই সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ দেখা, আর জীবিকার তাড়নায় সারাদিন নাকে দড়ি

দিয়ে খাটা। আর টাকার জন্যে খাটতে যে খুব খারাপ লাগে তাও নয়। আর তাছাড়া একলার জীবন। খাটবো না তো কী করবো? করবোটা কী? যে-কোনও রকমে সময়টা কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো। আমি একলা মানুষ। ক্লাবে যাই না, হোটেলে নাচতে যাই না, জুয়া খেলারও নেশা নেই। সুতরাং অফিসের কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখি সারাদিন। অফিস্ থেকে যখন সবাই চলে যায়, তখনও বসে বসে কাজ করি। তারপর সব কাজ শেষ করে সেই যে এসে উঠি আমার কোয়ার্টারে, আর বেরোই না। হয় বসে বসে চুপ-চাপ রেডিও শুনি। নয়তো জানালা দিয়ে দূরে [illegible]বিয়ান সী'র দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকি। এমনি করেই [illegible] আমার দিনগুলো। এমনি করেই কাটতো আরো কিছু [illegible]কিন্তু হঠাৎ ওই মেয়েটি এসে আমার লেটার-বক্স ব্যবহার [illegible] পর থেকে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হলো। মাঝে-মাঝে [illegible] মুখার্জির কথা ভাবতাম। ভাবতাম কত মানুষ কত ভাবে [illegible] [illegible]াকের কত না সমস্যা। কারো সমস্যা টাকা, [illegible] সম[illegible]স্থ্য, কারো সমস্যা সন্তান। এমনি কত লোকই তো আ[illegible] সংসারে। সকলের সব সমস্যার কথা যদি কেউ জানতে পারতো তো কত গোপন কথাই না প্রকাশ হয়ে পড়তো।

কিন্তু আমি তো মশাই লেখকও নই, দার্শনিকও নই। আমার ভাববার সময়ও নেই। আমি বার্মা শেলের একজন ইঞ্জিনীয়ার মাত্র।

জীবনে এও এক রকমের অভিজ্ঞতা মশাই। আপনাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও কিছু-কিছু গল্প লেখেন আপনারা। আর সকলের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেই তো ইতিহাস-দর্শনের সৃষ্টি। এমনি করেই কোটি-কোটি মানুষের যুগ যুগান্তের অভিজ্ঞতার ফলেই তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি। আমি ও সব জানি না। জানতে চাইও না। জানবার সময়ও আমার নেই। আমি অফিসে যে-বিশেষ

কাজটা করি, সেই কাজটার দামই বুঝি, সেই কাজটার দামই মাসে-মাসে পাই। আর সেই দামটার জন্যেই এত লেখাপড়া শিখেছি, এত পয়সা নষ্ট করেছি আর এখন তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছি। আমরা আসলে সবাই স্পেশালিস্ট। যে দাঁতের ডাক্তার সে দাঁত সম্বন্ধেই শুধু বোঝে। আর কিছু বোঝে না। যে ক্লার্ক, সে শুধু তার নিজের ফাইল ক'টাই বোঝে। সেইটেই তার পৃথিবী। সেই পৃথিবীর বাইরে সে আর কিছুই বোঝে না। আর কিছু বুঝতে চায়ই না। তার বোঝবার সময়ই নেই। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে তাই আমার মনে হয় বোধহয় সাহিত্যিকরাই একমাত্র সুস্থ জীব। একমাত্র সাহিত্যিকরা ছাড়া আর সবাই স্পেশালিস্ট। সাহিত্যিকদের কাছেই তাই আমার এত আশা। সেই জন্যেই আপনি [illegible] শুনে আপনার সঙ্গে যেচে আলাপ করলুম।

[illegible] যাহোক, তারপর বলি।

[illegible]রপর কয়েকদিন কেটে গেল। আর কোনও ঘটনা ঘটোন [illegible]কদিন। প্রায় মাসখানেক পরে আর একটা চিঠি এ[illegible]ট্রিক[illegible]স [illegible]মতা মুখার্জির নামে। আমার অন্য চিঠির সঙ্গে সেই তা[illegible]টাও পোস্ট্যাল্-পিওন্ আমার লেটার-বক্সে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। দেখলাম আগের চিঠিটার মত সেটাতেও কলকাতার পোস্ট অফিসের ছাপ। বৌবাজার পোস্ট-অফিস। আমি বার-দুই চিঠিটা নাড়া চাড়া করে আমার টেবিলে রেখে দিলাম। যদি মেয়েটি আসে কোনও দিন তো তাকে দিয়ে দিতে হবে।

কৃষ্ণানকে ডেকে সেই কথাই বলে দিলুম।

বললাম—আমি যদি বাড়িতে না থাকি তো সে মেয়েটি এলে যেন তাকে তার চিঠিটা দিয়ে দেয়।

কিন্তু পরদিনও এল না।

ভাবলাম—কী হলো! কোথায় কোন্ দেশমুখের বাড়ি। কী

করেই বা তাকে খবর পাঠানো যায়! কোনও উপায়ই নেই। এত বড় বোম্বে-সহরে সুমিতা মুখার্জিকে বার করা অত সহজ নয়। সুতরাং চিঠিটা পড়েই রইল ক'দিন টেবিলের ওপর।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েটি এল একদিন।

আমি তখন বাড়িতে। সেই যথা-নিয়মে সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়ছি। অফিস যাবার তখনও দেরি আছে। মেয়েটিকে দরজা খুলে দিলে আমার কৃষ্ণান।

বললাম—তোমার চিঠি আজ সাত দিন হলো এসে পড়ে আছে, ভাবছিলাম তোমার কথা। দেখলাম সেই আগেকার শাড়িটাই [illegible] জড়িয়ে এসেছে গায়ে। একটু যেন ময়লা ময়লা ভাব। [illegible] দিনের সেই জৌলুষ যেন একটু কমে এসেছে।

[illegible] করলাম—তোমার কি অসুখ করেছিল নাকি? [illegible] [illegible] যে এতদিন?

সুমিতা বললে—সময় পাইনি আসবার। সারাদিন টি[illegible] ক[illegible] তাই ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারিনি—

[illegible]র আমার হাত থেকে চিঠি নিয়ে বললে—গেল মাসে মাকে কম টাকা পাঠিয়েছিলুম, মা বোধহয় খুব রাগ করেছে—

জিজ্ঞেস করলাম—কেন, কম টাকা পাঠিয়েছিলে কেন?

সুমিতা বললে—আমার একটা শাড়ি কিনেছিলুম, তাইতে বারো টাকা খরচ হয়ে গেল। তারপর জিনিষ-পত্রের যা দর বাড়ছে, তাতে আর আগেকার মত টাকা পাঠাতে পারছি না।

বলে মেয়েটি চিঠিটা নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে নমস্কার করে গেল যথারীতি।

মেয়েটির সঙ্গে এই আমার তিনবার দেখা হলো। যখন প্রথমবার দেখি, তখন সাজ-গোজের মধ্যে একটা জৌলুষ ছিল। দ্বিতীয়বারে একটু কম। তৃতীয়বারে আরো কম। মেয়েটির জন্যে

আমার একটু দুঃখ হলো হয়ত মশাই। আমি যদি একটা চাকরি করে দিতে পারতুম তো ভালো হতো হয়ত। মনে হলো—এই রকম অনেক মেয়েই হয়ত জীবিকার জন্যে যুদ্ধ করছে আজকাল। সকলকে আমরা চিনি না। আমাদের যুগে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত তাড়াতাড়ি। তখন মেয়েদের কলকাতার রাস্তাতে চোখেই দেখা যেত না। আজকাল দিনকাল বদলে গিয়েছে। বিশেষ করে পার্টিশানের পর আরো সমাজের ছাঁচ্ বদ্‌লে গিয়েছে, যে-ছাঁচ আমরা দেখিনি বা দেখবার সুযোগ পাইনি। এদের সম্বন্ধে শুনে-ছিলাম অনেক কিছু। কলকাতায় যখন ছিলাম তখন রাস্তা-ঘাটে দেখেছিলুম কিছু কিছু। খবরের কাগজেও কিছুকিছু পড়েছিলুম। শুনতাম তারা নানা উপায়ে রোজগার করে পেট চালায় [illegible] স[illegible]তাল রেখে চলে। বোম্বেতে এসে দেখলুম এখান[illegible] [illegible]দিন [illegible] স্বাধীন আরো সেল্‌ফ্-সাপোর্টিং হয়ে গেছে। [illegible] [illegible]ন করে বাপ-মা-ভাই-বোনকে ভরণ পোষণ করে। কিন্তু [illegible]লী মেয়েদের স্বচক্ষে দেখবার অভিজ্ঞতা আমার হয়নি [illegible]তে [illegible]গেলে সুমিতা মুখার্জিই আমার বাঙালী মেয়ে সম্বন্ধে প্র[illegible]ত, [illegible] অভিজ্ঞতা।

তা সে যা' হোক। এই তিনবারেই সুমিতার আসা শেষ হলো না। আরো অনেকবার আমার বাড়িতে আসতে হলো তাকে। আরো অনেকবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। প্রত্যেকবারই আমার কাছে এসে চিঠি নিয়ে যেত। আর যাবার সময় যথারীতি নমস্কার করে যেত।

একবার জিজ্ঞেস করলাম—তোমার ভাই পাশ করলো?

সুমিতা বললে—না—

—কেন? পাশ করতে পারলে না কেন?

সুমিতা বললে—আমার বিধবা মা তো কিছু দেখতে পারে না

নিজে। আর আমার ভাইও মা'র কথা শোনে না। আমিও নেই, কে আর দেখছে তাকে বলুন!

—কিন্তু আর কতদিন তুমি তাকে এরকম টাকা পাঠিয়ে যাবে? যদি আবার পরের বছরেও ফেল করে?

সুমিতা বললে—ফেল করলেও অবাক হবো না, আমাদের পাড়ায় থাকলে, আমার ভাই মানুষ হবে না।

--কেন?

সুমিতা বললে—অনেক বদ্ বন্ধু জুটেছে দেখে এসেছিলাম, তাদের সঙ্গেই কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। লেখা-পড়ার দিকে মোটেই মন নেই। আব তা ছাড়া। কেউ তো দেখবার নেই [illegible]।

[illegible]—কিন্তু তুমিই বা এ রকম করে কতকাল টাকা পা[illegible]য়ে [illegible]মি কষ্ট করে টাকা উপায় করবে আর সে সেই [illegible] [illegible], সেটাও তো ভাল কথা নয়!

[illegible] একটু ভাবলে। তারপর বললে—আমিও তো ভা[illegible]।

এই[illegible] বলে চলে গিয়েছিল সেবার। প্রত্যেকবারই আসতো, আর প্রত্যেকবারই হতাশার কথা শুনতে হতো তার মুখ থেকে। কখনও শুনিনি যে সে ভাল আছে। কখনও শুনিনি যে তার বাড়ির খবর ভাল। বারবার তার মুখের চেহারায় হতাশা বয়ে নিয়ে আসতো আমার কাছে। বারবার মেয়েটি একটা সহানুভূতি আর দয়ার পাত্রী হয়েই ছিল। এমনি করে কতদিন কাটলো জানি না। মাসে দু'একবার করে আসতো আর গম্ভীর মুখে নমস্কার করে চলে যেত। যতবার আসতো ততবারই ভাবতাম—এইবার বোধহয় শুনবো যে তার ভাই পাশ করেছে। তার ভাই লেখা-পড়ায় মন দিয়েছে। তার মা আর তার ভাই বোম্বেতে চলে আসছে!

কিম্বা সে ভাল একটা চাকরি পেয়েছে, ভাল একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে।

কিন্তু প্রতিবারই তার মুখ থেকে হতাশার কথাই শুনতে হয়েছে।

তা ছাড়া আমার নিজের সমস্যাও তো ছিল। আমারও ফ্যামিলি ছিল কলকাতায়। তাদের আসবার ব্যবস্থা করছিলাম। বুড়ো বাবা-মা'র জন্যে আমার স্ত্রীকেও থাকতে হতো কলকাতায়। আর বোম্বাইয়ে আমারও থাকার পাকা বন্দোবস্ত তখনও হয়নি। চেষ্টা করছিলাম আবার কলকাতার অফিসে ফিরে যেতে। আমিও আমার নিজের ভাবনা ভাববো, না সুমিতার কথা ভাববো। আধুনিক সভ্যতার রিলে-রেসে আমরা পরের ভাবনার [illegible] [illegible]থায় পাই বলুন ?

[illegible]যা' হোক, এমনি যখন অবস্থা তখন একদিন হঠাৎ [illegible] [illegible]না। আমি এ-কাণ্ডটার জন্যে মোটেই তৈরি ছিলু[illegible] [illegible]ন কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা-ও কল্পনা করতে পারিনি[illegible]

জিজ্ঞেস করলাম—কী কাণ্ড ?

মিষ্টার মুখার্জি বললেন—অনেক দিন পরে হঠাৎ আম[illegible] একদিন খেয়াল হলো, কই, সেই মেয়েটা তো আর আসছে না! অনেকদিন পর পর এসে এসে আমার এখানে তাব আসাটা এমন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল যে, তার না-আসাটা আর খেয়ালের মধ্যে আসেনি। কবে যে আসতে আসতে একদিন কোন্ সময়ে তার আসা বন্ধ হয়েছে, তা খেয়ালই করতে পারিনি। রোজ সকালে সূর্য ওঠে। সূর্য ওঠাটা আমাদের যেন দৈনিক পাওনা হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় —আমাদের যেন একটা অধিকার জন্মে গেছে বুড়ো সূর্যটার ওপর। সূর্য যদি কোনও দিন না ওঠে তো তা সূর্যেরই অপরাধ। আমারও তেমনি কথাটা মনে পড়তেই বেশ রাগ হতে লাগলো মেয়েটার

ওপর। যখন দরকার ছিল, তখন প্রায়ই এসেছে। আমার কাছে এসে দরবার করেছে। তারপর যখন দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে তখন যেন আর অনুমতি চাইবার দরকার নেই। বলে গেলেই পারতো যে এবার থেকে তার ভাই তার মা এসেছে বোম্বাইতে, এবার আর আমার লেটার-বক্স ব্যবহার করবার দরকার নেই। এ-কথাটা বলে গেলে কী এমন ক্ষতি হতো ?

আমি কৃষ্ণান্‌কে ডাকলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—সেই জেনানা আর কখনও কোনও দিন এসেছিল কি না ?

কৃষ্ণান বললে—না হুজুর, আর আসেনি কোনওদিন।

[illegible] আসাও বন্ধ হয়েছে, তারও আসা বন্ধ হয়েছে। অর্থাৎ [illegible] য এতদিন পরে হয়তো সুমিতা একটা ভালো চ[illegible]রি [illegible]রে নিতে পেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফ্ল্যাটও জো[illegible] করে [illegible]নিয়েছে। মা'কে আর ভাইকে কলকাতা থেকে [illegible] এ[illegible] নিজের ফ্ল্যাটেই হয়ত একটা লেটার-বক্স লাগিয়ে[illegible] এখন [illegible] যা-কিছু চিঠিপত্র সেই লেটার-বক্সেই এসে পৌঁছোয়। আর মা-ভাই কলকাতা থেকে চলে আসার পর তার আর কারো চিঠি পাবার তাড়াও নেই তেমন। মা-ভাইকে নিয়েই তার সমস্যা ছিল। সেই সমস্যাটা মিটে গেলে আর কার চিঠিই বা সে পাবার জন্যে আকুল হবে ? আর কে-ই বা আছে তার ? ছোটবেলায় বিধবা হয়েছে, সুতরাং আর কোনও কামনাই নেই তার জীবনে। মা-আর ভাই-এর ভরণ-পোষণ ছাড়া তার আর কিছু চাইবারও নেই জীবনে।

যা'হোক, ভাবলাম ভালোই হয়েছে। একজন দুঃস্থ বাঙালী বিধবা মেয়ে বোম্বাইতে এসে নিজের জীবিকার স্বচ্ছল ব্যবস্থা করতে পেরেছে, এটা ভেবেও আনন্দ হলো। এমনভাবে নিজেদের পায়ে

নিজেরা দাঁড়াতে না শিখলে বাঙালীদের আর কেউ সাহায্য করবে না যেচে। দিনকাল যে-রকম পড়েছে তাতে স্বাবলম্বী না-হতে পারলে আর কোনও ভরসাই নেই কারো। সকলেই নিজের-নিজের স্বার্থের কথা ভেবে আত্মরক্ষা করতে হবে। তবেই আমরা বাঁচবো।

কিন্তু আসলে ঘটনাটা ঘটলো অন্যরকম। আমি যা ভাবতেও পারিনি আসলে তাই-ই ঘটেছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম ?

মিষ্টার মুখার্জি বললেন—সেরকম ঘটনা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

বললাম—মেয়েটি বুঝি কলকাতাতেই ফিরে গিয়েছিল?

মিষ্টার মুখার্জি বললেন—না—

—তবে ? কোনও মারাঠিকে বিয়ে করেছিল ?

মিষ্টার মুখার্জি বললেন—না, তাও না—

—তাহলে ?

মিষ্টার মুখার্জি বললেন—না, আপনি লেখক মানুষ [illegible] ...না করতে পারছেন না। তাহলে আমার অবস্থাটা ভাবুন। আমি কি রকম অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, ভাবুন !

বললাম—কী হলো তাই বলুন ?

মিষ্টার মুখার্জি বললেন—তাহলে শুনুন। আমি একটা রবিবারে যথারীতি খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়িতে বসে আছি। হঠাৎ কৃষ্ণান্ এসে বললে—এক বাঙ্গালীবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—

বললাম—ভেতরে নিয়ে আয়—

ভদ্রলোক ভেতরে এলেন। আমি আপাদমস্তক দেখেও চিনতে পারলুম না তাঁকে। হাতে একটা স্যুটকেশ। গায়ে কোট। কোটের ওপর চাদর। অল্প-অল্প গোঁফ রয়েছে। মাথার চুল উস্কো-

খুস্কো। চেহারা দেখে মনে হলো-যেন অনেক দূর থেকে এসেছেন ভদ্রলোক। ট্রেন থেকে নেমেছেন সবে।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কা'কে চান?

ভদ্রলোক স্যুটকেশ রেখে আমাকে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। বললেন—আপনিই তো মিষ্টার মুখার্জী? বার্মাশেলের ইঞ্জিনিয়ার? আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি ইস্টার্ন রেলওয়েতে চাকরি করি। আমার নাম—নিরাপদ দত্ত। আমি আপনার ভায়রা-ভাই।

আমি যেন কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। আমার স্ত্রী [illegible] আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। আমার ভায়রা-ভাই কোথা [illegible]

[illegible] আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না—

[illegible]দবাবু বললেন—আমি আপনার আপন ভায়রা-[illegible] আপ[illegible] সুমিতার কাছে আমার কথা শোনেন নি? সুমি[illegible] আম[illegible]ঠি লিখতো, তার চিঠিতেই আপনার কথা অ[illegible] শুন[illegible]নার সব পরিচয় আমাদের পাওয়া হয়ে গিয়েছে। তবে রেলের চাকরিতে পাশ পাই বটে, কিন্তু কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনি কখনও। আর শুধু পাশ পেলেই তো দেশ ভ্রমণ হয় না, ছুটি আমাদের পাওয়া যায় না কিনা—

তুতক্ষণ কথা বলতে-বলতে আমার সোফার ওপর বসে পড়েছেন তিনি।

বলতে লাগলেন—আপনাদের সোনার অফিস মশাই, রেলের মত হতচ্ছাড়া অফিস আর ভূ-ভারতে নেই। ফ্রি পাশ দেবে, কিন্তু ছুটি চাইলেই ব্যাজার। আর তা'ছাড়া দেশ-ভ্রমণ যে করবো, তাতেও তো টাকা খরচ। কতদিন থেকে ভাবছি এখানে আসবো সপরিবারে, কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা ছোট, নইলে গিন্নীকেও

পাঠিয়ে দিতাম আপনাদের কাছে। সুমিতা অনেকবার লিখেছে আসতে—কিন্তু আমাদের মত মধ্যবিত্ত সংসারে একটা না একটা ঝঞ্জাট লেগেই আছে, কিছুতেই ফুরসুৎ পাই না। শেষে অফিসের ডিউটিতে এদিকে এসেছিলুম, তাই ভাবলাম একবার আপনার সঙ্গে আলাপ করে যাই। আপনার সঙ্গে আলাপ করাও হবে, সুমিতার সঙ্গে দেখাটাও হয়ে যাবে—

ভদ্রলোক কথাগুলো বলে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি তখন যেন আকাশ থেকে পড়েছি।

বললাম—আপনি কী বলছেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না—সুমিতা আপনার কে?

ভদ্রলোক বললেন—সুমিতা আমার নিজের শ্যালিকা,

বলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললাম—কিন্তু তার সঙ্গে আমার তো কোনও সম্পর্ক [illegible]

[illegible]—সম্পর্ক নেই মানে? সুমিতা মুখার্জি, সে আপনার [illegible]র, [illegible] আপনার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই! আপনি ব[illegible]ী,

বললাম—আপনি হয়ত ভুল শুনেছেন। আমি [illegible]কে চিনি বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই। সে কোথায় থাকে তাও জানি না—

ভদ্রলোক এবার চমকে উঠলেন। বললেন—সে কী? আপনার স্ত্রী আপনার বাড়িতে থাকে না?

বললাম—আপনি ভুল করছেন, সে আমার স্ত্রীই নয়।

—আপনি তাকে বিয়ে করেন নি?

বললাম—না—

—তাহলে সে যে চিঠিতে লিখতো আপনি তার স্বামী! তার চিঠিতে আপনার যে-রকম চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল, এই বাড়ির যে-রকম বর্ণনা দিয়েছিল সবই মিলে যাচ্ছে। আমরা তো তাকে

এই ঠিকানাতেই চিঠি দিতাম, সে-চিঠি তাহলে সে একখানাও পায়নি ?

বললাম—না, তা পেয়েছে। মাঝে-মাঝে এখানে এসে তার চিঠি সে নিয়ে যেত এই পর্যন্ত। তার বেশি আর কিছুই জানি না। শুনেছিলুম সে বিধবা, এখানে চাকরি করে তার মাকে টাকা পাঠায়, তার মা-ও বিধবা, শুধু তার এক নাবালক ভাই আছে—

—কী সর্বনাশ !

বলে ভদ্রলোক যেন লাফিয়ে উঠলেন।

বললেন—সে বিধবা ? বিধবা হলো কবে ?

বললাম—সে তো খুব ছোটবেলায়, যখন তার দশ বারো বছর [illegible]

[illegible] ক মশাই, আমার নিজের শালী সে, তাকে জানি না, [illegible]ান বলছেন সে বিধবা ? বিধবা হলো সে কবে ? [illegible]র বি[illegible]বা হলো কবে ?

[illegible]ম—তা তো আমি জানি না। সে যা বলেছিল ত[illegible]ই আ[illegible]কে বলছি ! তার মা নাকি তার ছোট-ভাইকে নিয়ে কলকাতায় থাকে, তাদের টাকা পাঠাতো সে এখান থেকে !

ভদ্রলোক বললেন—এ-সব যে একেবারে বাজে কথা মশাই। তার মা'কে সে দেখেই নি। তার ভাইও কেউ নেই। দু'টি মাত্র বোন, বড় বোনকে আমি বিয়ে করেছিলুম আর সুমিতাও আমার সংসারে থাকতো, একটা পয়সাও তো সে আমাকে কখনও পাঠায়নি ?

বললাম—এখানে তার মামা কেউ ছিল ? রেলে চাকরি করতো ?

ভদ্রলোক বললেন—মামা থাকলে সে কখনও আমার ঘাড়ে পড়ে থাকতো ? আমিই তো তাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ

করেছি, লেখা পড়া শিখিয়েছি, সব করেছি আমি আমার রেলের চাকরির ওপর নির্ভর করে—

জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে সে এ-সব কথা বলতে গেল কেন ?

নিরাপদবাবু বললেন—ভগবান জানে ! কিন্তু আপনার সঙ্গে তার পরিচয় হলো কেমন করে ? তাকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন ?

আমি সবিস্তারে সব বললাম তাঁকে। আমার লেটার-বক্স ব্যবহার করবার অনুমতির জন্যে একদিন নিজের থেকে কেমন করে এসে পরিচয় করেছিল, সব খুলে বললাম।

নিরাপদবাবু সব শুনে বললেন—তাজ্জব ব্যাপার তো, তাহলে কী হবে ? কোথায় গেলে তার সঙ্গে দেখা হবে ?

বললাম—তাও তো আমি জানি না। শুনেছিলুম [illegible] প্যা[illegible]লের কাছে কোন বস্তিতে থাকে। আর কোথ[illegible] দিন টি[illegible]নি করে বেড়ায়। এখানে মালাবার হিল্-এ কোন্ [illegible] [illegible] বলে ভদ্রলোক আছেন, তাঁর মেয়েদের ইংরিজী পড়ায় [illegible]

নিরাপদবাবু বললেন—ইংরিজী পড়াবে ? সে যে ম[illegible]ট্রিক [illegible] পাশ করেনি, সে ইংরিজী পড়াবে কেমন করে ?

বললাম—কিন্তু সে তো বললে কোন্ কন্‌ভেন্টে নাকি পড়েছে ?

—দেখেছেন ? সব ব্লাফ দিয়েছে আপনাকে। পিওর ব্লাফ। আসলে আমার ওই একটি মাত্র শালী। যখন ওর তিন বছর বয়েস তখন থেকে আমিই ওকে মানুষ করেছি। সেই তিন বছর বয়েস থেকে আরম্ভ করে আমিই বলতে গেলে ওর বাবা ছিলাম। অল্প বয়সে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী মারা যাওয়াতে আর কেউ দেখবার ছিল না, তাই আমার স্ত্রীই ওকে আমার কাছে নিয়ে আসে, আর আজ কিনা এই সব মিথ্যে কথা বলে আপনাকে ব্লাফ দিয়েছে ?

বললাম—তা ওকে বোম্বেতে আসতে দিলেন কেন একলা ? এখানে কার ভরসায় ও এলো ?

নিরাপদবাবু বললেন—এই দেখুন, আপনিও ভুল বুঝেছেন সব। আমি ওকে বোম্বে পাঠাবো কেন? আমি তো ওকে মানুষ-টানুষ করে ওর বিয়ের ঠিক-ঠাক করছিলাম, এমন সময় কোথায় হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

—তার মানে?

নিরাপদবাবু বললেন—সে এক লম্বা ইতিহাস মশাই, সে-সব কি আপনার শোনবার সময় আছে এখন?

বললাম—সময় আছে, আপনি বলুন—আজকে ছুটির দিন, আমার অফিস নেই—

[illegible]পদবাবু বললেন—তাহলে শুনুন। আমি ছাপোষা একজন [illegible]রানী। বুঝতেই পারছেন আমার সামর্থ্য কতটুকু। [illegible]নে যা পাই তাইতেই আমার কোনও রক[illegible]লে [illegible] দু'তিনটি কাচ্ছা-বাচ্ছা আমার নিজেরও আছে। আর[illegible] তে[illegible]রো পর হতে পারে না। আমি আমার নিজের মেয়ে[illegible]ই [illegible]তাবে মানুষ করেছিলাম ছোটবেলা থেকে। তা বৌবাজ[illegible]য কী ভয়ানক জায়গা তা হয়ত আপনার জানা নেই। দু'টি খুপচি ঘরের মধ্যে আমার সংসার। সেই সংসারে টেনে-টুনে এক রকম করে চালাচ্ছিলুম। সুমিতা যখন যা চেয়েছে আমার সাধ্যমত আমি তা জুগিয়েছি। কাপড় চেয়েছে, কাপড় দিয়েছি, গয়না চেয়েছে, গয়না দিয়েছি। নিজের মেয়েকে লোকে যে করে মানুষ করে সেইভাবে সুমিতাকেও মানুষ করেছি। ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলুম। লেখা-পড়াও করছিল। কিন্তু ক্লাস সিক্সের পরে আর পড়তে চাইলে না। একবার পরীক্ষায় ফেল করলে কী এমন লজ্জা, বলুন? ফেল তো সকলেই করে। আমি আবার পড়তে বললুম—যত টাকা লাগে আমি দেব, পড়া যেন না ছাড়ে।

নিরাপদবাবু এবার একটু হাঁফ ছাড়লেন।

আবার বলতে লাগলেন—তা পড়া সকলের কি হয় ? অনেক লোক তো লেখা-পড়াই শেখেনি। তারা কি বিয়ে করছে না ? সংসার করছে না ? লেখা-পড়া না করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় ? তা আমি কিচ্ছুই বলিনি মশাই। ফেল করার জন্যে আমি বকিনি, মারিনি, ধরিনি। কিচ্ছুটি বলিনি। বলেছিলুম—তোমার যা খুশী করো আমার কোনও আপত্তি নেই। আমার স্ত্রী সুমিতাকে মাঝে-মাঝে একটু বকতো-সকতো তা নিজের দিদি, কিছু বলা কি এতই অন্যায় ? আপনিই বলুন।

নিরাপদবাবু বলতে লাগলেন আবার—তা আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলুম, ওকে অমন করে বোকো না, ওর এখন [illegible] হয়েছে, ও ভাববে ওর বাবা-মা নেই বলেই আমরা [illegible] শাসন করি—

[illegible]পদবাবু এবার থামলেন একটু।

[illegible]াম—তারপর ?

[illegible]াপদবাবু বললেন—তারপর মশাই সিনেমা দে[illegible] ঝোঁক ছিল সুমিতার। প্রায়ই দিদির কাছে পয়সা নিত সিনেমা বায়োস্কোপ দেখবার জন্যে। আমার স্ত্রী বলতো বায়োস্কোপের শখ ভাল নয়, শেষকালে হয়তো নেশা লেগে যাবে! অত বায়োস্কোপের নেশা কি ভালো, আপনিই বলুন না ?

বললাম—তা তো বটেই !

নিরাপদবাবু বললেন—রোজই সিনেমা দেখা চাই মশাই, এমন নেশা হয়ে গেল শেষকালে! শেষে আমি একদিন খুব বকলুম—

—আপনি বকলেন ?

নিরাপদবাবু বললেন—আমার অবস্থা তো বলেছি আপনাকে। রেলের চাকরিতে আর কতই বা মাইনে আমার। আমাকে বাড়িভাড়া দিয়ে, ছেলে-মেয়েদের চাল-ডাল-দুধ কিনে তার ওপর

আবার যদি সিনেমা বায়োস্কোপের পয়সা জোগাতে হয়, তাহলে কেমন করে চলে বলুন!

বললাম—সুমিতা সিনেমা দেখা বন্ধ করলে ?

নিরাপদবাবু বললেন—না মশাই, তখন খুব নেশা হয়ে গেছে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগলো। আমার স্ত্রীও জানতো না, আমিও জানতুম না, একদিন ধবা পড়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম—পয়সা কে দিত ?

নিরাপদবাবু বললেন—পাড়ার ছেলেরা। বৌবাজারে আমাদের পাড়ার ছেলেদের তো আপনি চেনেন না। তারা সব পারে মশাই! [illegible]কে তারাই সিনেমা দেখাব পয়সা যোগাতে লাগলো।

[illegible]ম—আপনারা জানতেই পারেন নি ?

[illegible] মশাই, একদম জানতে পারিনি। আমার স্ত্রীও [illegible]নতে [illegible], আমিও জানতে পারিনি। আমরা ভেবেছি পাড়া[illegible] স[illegible]তে সেলাই শিখতে যায়। সে যে তলে-তলে সিনেম[illegible]তে [illegible] তা কী করে জানবো! যেদিন ধরা পড়লো, সেদিন [illegible]বার বকলুম খুব। আমার স্ত্রীও খুব বকলে।

—তারপব ?

নিরাপদবাবু বললেন—তারপর একদিন দেখি পাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে পার্কে বসে গল্প করছে। দেখে আমার রক্ত মাথায় উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে নিয়ে বাড়িতে এলুম। বললুম—এবার থেকে বাইরে বেরোন বারণ। আর সেদিন থেকে বাইরে বেরোতে দিলুম না। সারাদিন বাড়িতে থাকো, বাড়িতেই গল্প করো, যা ইচ্ছে খাও, আমি কিছুই বলবো না, কিন্তু ভদ্র গেরস্ত বাড়ির মেয়ে ও-সব বেলেল্লাপনা সহ্য করবো না আমি!

তা সেইদিন থেকে আমি সুমিতার একটা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে চেষ্টা করলুম। ভাবলাম বিয়ে দিলে হয়ত সব শুধরে যাবে।

কিন্তু বিয়ে দেওয়া কি এত সহজ মশাই! বাঙলা দেশে মেয়ের বাপ যারা তারাই জানে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কী জিনিষ। আমি কেরানী মানুষ, ছাপোষা গেরস্থ লোক, বিয়ের টাকাই বা কোথায় পাবো? কে নিজে থেকে এসে সুমিতার মত লেখা-পড়া না-জানা মেয়েকে বিয়ে করবে বলুন?

বললাম—তা তো বটেই—

—আমাদের মেয়েদের কি বিয়ে দেব বললেই দেওয়া যায়? আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাঙালীদের ব্যাপার। এক-কাঁড়ি টাকা না-হলে মেয়ের বিয়ে কি দেওয়া যায়? আপনিই বলুন? আমি কত কষ্ট করে একটি পাত্র যোগাড় করলুম মশাই, আমাদের [illegible] চাকরি, সিনিয়র গ্রেড্ পেয়েছে। শ'পাঁচেক টাকা [illegible] দান[illegible]মগ্রী, আর বেশি কিছু দিতে হবে না। বর-[illegible]দিন এ[illegible]সুমিতাকে দেখেও গেল। পছন্দও করে গেল [illegible] সু[illegible] তো অপছন্দ হবার মত মেয়ে নয়। তা আমিও [illegible]র চে[illegible] ঘোরাঘুরি করছি। পাঁচশো আমি হুট্ করে কোথ[illegible] থে[illegible] বা যোগাড় করবো বলুন! শালীর বিয়ের জন্যে তো আর কাবলীওলার কাছে ধার করতে পারি না! তা সেই টাকাট যোগাড় করতে গিয়েই দু'এক মাস দেরি হয়ে গিয়েছিল। শেষকালে যখন যোগাড় হলো টাকাটা তখন হঠাৎ একদিন আমার স্ত্রী বললে—সুমিতা সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরেনি—

আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। বাড়ি ফেরেনি মানে! বাড়ি ফিরবে না তো যাবে কোথায়! যেখানেই যাক্ বাড়িতে ফিরতেই হবে তাকে। ভাবলাম—আরো একটু দেখি। হয়ত আবার লুকিয়ে লুকিয়ে কারো সঙ্গে সিনেমায় গেছে। রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলুম, তখনও এলো না। শেষে দশটা বাজলো, তখনও না। তখন মহা ভাবনায় পড়লুম মশাই। এত রাত পর্যন্ত বাইরে

থাকা কি ভালো ? হাজার হোক, আমার তো একটা দায়িত্ব আছে একটা কিছু যদি হয় তো লোকে তো আমাকেই দুষবে। বলবে —বাপ মা নেই বলে ভগ্নিপতিটা একবার খোঁজখবরও নিলে না তা কোথায় আর খুঁজবো ? একবার গেলাম রাস্তায়। তখন বেশ অন্ধকার চারদিকে। এ এমন ব্যাপার যে কারোর কাছে বলাও যায় না। জানলে লোকে বলবে—বেশ হয়েছে। সবাই টিটকিরি দেবে, ছুয়ো দেবে। সংসারে কেউ তো কারোর ভালো দেখতে পারে না! বিশেষ করে বাঙালীরা। তা শেষকালে উপায় না-দেখে থানায় গিয়ে ডায়েরী করে এলুম। ভাবলাম—আর দেরি করা [illegible] নয়। রাত এগারটার সময়ও যখন এলো না, তখন আর [illegible] করে থাকি কী করে বলুন।

[illegible] স্ত্রী তো মহা-খাপ্পা। নিজের ছেলে-মেয়ের [illegible]কটা [illegible] তো আছেই, তার ওপর আবার নিজের আইবুড়ো [illegible]ন, ত[illegible] ভাবনা কে ভাবে ?

আমার স্ত্রী বলতে লাগলো—এ মেয়ে আমার নির্ঘা[illegible] মুখ পোড়াবে !

আমি বললাম—তুমি ভাবছো কেন, হয়ত কোথাও আটকে গেছে, আসতে পারেনি – কাল সকালেই হয়ত এসে হাজির হবে—

আমার স্ত্রী বললে – কাল সকালে যদি পোড়ারমুখী আসে তো আমি তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেব ভেবেছ ?

আমার স্ত্রী একটু রাগী মানুষ। সংসারের পাঁচটা ঝামেলায় তার মেজাজ সব সময়েই তিরিক্ষি হয়ে থাকতো। আমি কিছু আর বললাম না সেদিন। কিন্তু তার পরের দিনও আর স্নিগ্ধা এলো না। তার পরের দিনও না। ওদিকে পুলিশ কিছু করতে পারলে না। আমি কি করবো বুঝতে না পেরে নিরুপায় হয়ে রইলুম।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর।

—তারপর আর কী! তারপর একটা চিঠি এখান থেকে গিয়ে হাজির। তা-ও প্রায় দু'বছর পরে। আমরা চিঠি পেয়ে অবাক। চিঠির ওপরে বোম্বের পোষ্টাফিসের ছাপ রয়েছে। ভেতরে পড়ে দেখি—সুমিতা লিখেছে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তার স্বামী বার্মা-শেল কোম্পানীর একজন ইঞ্জিনীয়ার। দু'হাজার টাকা মাইনে। খুব সুখেই দিন কাটছে তার। দু'খানা গাড়ি, কাম্বালা হিলের ওপর পাঁচতলা বাড়িতে তার কোয়ার্টার। ইত্যাদি ইত্যাদি। কত কথা যে লিখেছে। চিঠিটা লিখেছে আমার স্ত্রীকে। শেষে লিখেছে—আমি খুব সুখে আছি। আমার জন্যে তোমরা কিছু ভেবো না। জামাইবাবুকেও ভাবতে বারণ করে দি[illegible] [illegible] সুস্মিতা।

চিঠিটা পড়ে আমার স্ত্রী আমাকে এগিয়ে দিলে।

আমিও চিঠি পড়লুম। পড়ে কী বলবো বুঝতে পার[illegible]না। ভালো হলো না মন্দ হলো বুঝতে পারলুম না ঠিক।

আমার স্ত্রী বললে—এখন কী করতে চাও বলো?

বললাম—কী আর করবো? আমরা তো তার ভালোই চেয়েছিলুম, তার ভালো হলেই ভালো। সে ভালো থাকুক, সে সুখী হোক, তার চেয়ে আর বড় কামনা আমাদের কিছু নেই। তাকে আশীর্বাদ করে একটা চিঠি দাও।

তা তাই দেওয়া হলো। সুস্মিতাকে আশীর্বাদ করে এই ঠিকানাতেই একটা চিঠি দেওয়া হলো।

তার দিন পনেরো পরে আবার একখানা চিঠি এল। তাতেও লিখেছে তার নিজের সুখের কথা। লিখেছে—জামাইবাবু আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কোন্ এক রেলের কেরানীর সঙ্গে, সেখানে বিয়ে হলে কি আমি এত সুখী হতুম? আমার কি দু'টো গাড়ি

হতো? এত বড় বাড়ি হতো? সেই বাড়ির জানালা দিয়ে কি সমুদ্র দেখা যেত? সেখানে রাঁধতে রাঁধতে আর বাটনা বাটতে বাটতে আমার হাত হয়ত ক্ষয়ে যেত। এখন তোমরাই বিচার করো আমি ঠিক করেছি না ভুল করেছি।

আমরা যত চিঠি পেতে লাগলুম ততই অবাক হয়ে যেতে লাগলুম ভাবলুম—কার কপালে কী লেখা থাকে কেউ কি বলতে পারে? নইলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়া মেয়ের এত ভালো বিয়ে হবে কে ভাবতে পেরেছিল? সুমিতা যে সেদিন আমাদের অমতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল সে তো ভালোই করেছিল! খারাপ করেছিল কী করে বলি? আমাদের বলবার আর মুখ কোথায় [illegible]

[illegible] বিছানায় শুয়ে স্ত্রীকে বললাম—কী হলো, তুমি কিছু বল[illegible] যে?

[illegible]মার স্ত্রী দেখতুম ক্রমেই গম্ভীর হয়ে আসছিল। সু[illegible]র [illegible]াসতে লাগলো ততই যেন খিটখিটে মেজাজের হয়ে[illegible]ত ল[illegible]লো। সুমিতার কথা উঠলেই চটে যেত। আগে আমার স্ত্রী দিনরাত সংসার নিয়ে মেতে থাকতো। ছেলে-মেয়েরা কী খাবে, কী পরবে, সেই ভাবনা নিয়েই থাকতো কেবল। কিন্তু সুমিতার চিঠিগুলো পাবার পর থেকে যেন অন্য রকম মানুষ হয়ে গেল।

আপনি তো জানেন আজকাল সংসার খরচ কী ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। কী ভাবে দাম চড়ছে সব জিনিষের। আমি স্ত্রীকে যে ভাবে রাখা উচিত তা রাখতে পারতুম না। কোথায় সুমিতার গাড়ি-বাড়ি-চাকর-ঝি-খানসামা-বাবুর্চি আর কোথায় আমার স্ত্রীকে ভোর বেলা উঠে নিজের হাতে রান্না করা থেকে শুরু করে বাটনা-বাটা বাসন মাজা সবই একলা করতে হতো। [illegible]

বরই ও-সব কাজ করতে হতো, কিন্তু সুমিতার চিঠি আসার আগে পর্যন্ত ও-সব নিয়ে কখনও অনুযোগ করেনি। আমার স্ত্রী ভাবতো সুখ সকলের কপালে থাকে না। কষ্ট করে সংসার চালালে হয়ত একদিন ভবিষ্যতে সুখ আসবে—সেই আশাতেই দিন কাটাতো। কিন্তু সুমিতার চিঠিগুলো আসার পর থেকেই আমার স্ত্রীর মনে হতে লাগলো যেন তার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের জন্যে আমিই দায়ী। আমি আগে কম টাকা মাইনে পেয়েও মনের সুখে ছিলাম। আমার অভাবটা আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ভাগ করে নিতাম। কিন্তু ক্রমেই মনে হতে লাগলো যেন আমি অপরাধী। আমি আমার স্ত্রীকে বিলাস দিতে পারিনি, বৈভব দিতে পারিনি, স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারিনি। মনে হলো আমি পাপ করেছি।

সুমিতা চিঠিতে লিখতো—তার সুন্দর ছেলে হ[illegible]কটা। [illegible] তার স্বাস্থ্য, তেমনি তার রূপ। আট পাউণ্ড ওজ[illegible]শি। [illegible]র নার্স সবাই নাকি খুব প্রশংসা করেছে তার ছেলেকে। [illegible] চিঠি পড়ে আমার স্ত্রী আমার নিজের ছেলে-মে[illegible] চেয়ে দেখতো। তাদের রোগা হাড় জিরজিরে চেহারা, ময়লা জামা-কাপড়—সব কিছু আমার স্ত্রীর জীবন যেন বিষিয়ে দিত। আমার বৌবাজারের বাসা-বাড়ির দশ মাইলের মধ্যে কোথাও আরব সমুদ্র নেই, কোথাও ফুলের বাগান নেই। বিকেল বেলা ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আমার। দু'মুঠো খাবারের চেষ্টায় আমাকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। আমি কেরানী। অল্প মাইনের কেরানী আমি। আমি পরিবারের সকলকে পেট ভরে আহারের যোগান্ দিতে পারি না। আমি নিরুপায় নিঃসহায় নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী।

আমার স্ত্রীর মুখে যত কথা কমে আসতে লাগলো, আমিও তত এই সব কথা ভাবতে লাগলুম।

একদিন আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলুম—তুমি আর কথা বলো না কেন, আগের মত ?

আমার স্ত্রী বললে—কই,কথা তো বলি।

—না, সেই আগেকার মত তো আর হাসো না?

আমার স্ত্রী বললে—পাগলের মত হাসবো কেন মিছিমিছি ?

বললাম—তুমি যেন কেমন বদলে গেছ ইদানীং।

এ-সব বাজে কথা শোনবার মত ধৈর্যও আর ছিল না আমার স্ত্রীর।

জিজ্ঞেস কবতাম—তোমার কি শরীর খারাপ ?

আমার স্ত্রী বলতো —না, শরীর খারাপ কেন হতে যাবে !

[illegible] আমার মশাই যত দিন যেতে লাগলো ততই যেন ভয় করতে [illegible]লা। আমাব স্ত্রী তো এমন ছিল না। এমন গম্ভীর মা[illegible] কোন কালেই ছিল না। কেমন যেন শুকিয়ে [illegible]তে লা[illegible] দিন দিন। ছেলে-মেয়েদের অবহেলা করতে লা[illegible]। [illegible] সংসারের সমস্ত কাজে গাফিলতি করতে লাগ[illegible]। পাড়ায় কত বড়লোক ছিল, এতদিন তাঁদের ঐশ্বর্য তাকে বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু নিজেব মায়ের পেটের বোনের ওই উন্নতির খবরে যেন একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গেল আমার স্ত্রী।

এক-একটা চিঠি আসে সুমিতার আর তার আরো ঐশ্বর্যের খবর আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী যেন মুষড়ে পড়ে, ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। চিঠি এলেই আমি অফিস থেকে এসে বুঝতে পারতুম। বুঝতে পারতুম কী মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছে সুমিতা!

শেষকালে মনে মনে প্রার্থনা করতাম আর যেন সুমিতার চিঠি না আসে। আর যেন সে তার দিদিকে আঘাত না দেয়। কিন্তু সুমিতাকে সে কথা লিখতে পারতুম না। তাকে জানাতে পারতুম না কী দুঃখ পাচ্ছে তার দিদি তার চিঠি পেয়ে।

আজ আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি সেই আঘাতটুকু দেবার জন্মেই হয়ত সুমিতা অমন করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে চিঠি লিখতো। কিন্তু আমার স্ত্রী তো তা জানতো না।

শেষকালে ঠিক করলুম আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সকলকে নিয়ে একবার কোথাও বেড়িয়ে আসবো। কিছু টাকা ধার করলুম আমি। যে কোনও রকমে আমার স্ত্রীকে খুশী করতেই হবে। কিন্তু কোথায় পাবো সুমিতার স্বামীর মত অত টাকা, কোথায় পাবো সুমিতার স্বামীর মত অত বড় চাকরি। তবু পেছপাও হলাম না। স্ত্রীকে নিকে গেলাম বেনারসে। রেলের টিকিট লাগলো না বটে, কিন্তু ধর্মশালায় উঠে টাঙ্গা ভাড়া, কিংবা খাওয়া-খরচ তো [illegible]। ক'দিন খুব দু'হাতে খরচ করলুম। যা দেখলুম স[illegible] দিলুম। স্ত্রীকে বেনারসী শাড়ি, ছেলে মেয়েদের [illegible] কাপড় [illegible]না। হোটেলে নিয়ে গিয়ে প্রচুর খাওয়ালুম। নৌ[illegible] ভাড়া [illegible] রামনগরে নিয়ে গেলুম। মনে হলো আমার স্ত্রীর [illegible] যেন একটু হাসি ফুটলো।

একদিন বললুম—সুমিতা সুখী হয়েছে, এ তো ভাল কথা—সে সুখী হলে আমাদের তো আনন্দ হবারই কথা—

আমার স্ত্রী বললে—আমি কি তাই বলেছি ?

বললাম—সে জন্যে আমি বলছি না, তুমি তাকে চিঠিতে জানিয়ে দিও যে, তার সুখেই আমাদের সুখ, তার ছেলে হয়েছে, তাতে আমাদের খুব আনন্দই হয়েছে।

আমার স্ত্রী বললে—তা তো আমি লিখিই—

বললাম—আরো লিখে দিও যে, আমরা সময় পেলেই তার কাছে যাবো, তার ছেলেকে আশীর্বাদ করে আসবো, তাকেও আশীর্বাদ করে আসবো। সে নিজের পছন্দমত বিয়ে করেছে বলে তার জামাইবাবুর কোনও রাগ নেই তার ওপর—

এই সব কথাই অবশ্য বরাবর আমার স্ত্রী লিখেছে। অত বোকা নয় আমার স্ত্রী। কিন্তু হঠাৎ এক বিপদ হলো। বিপদ কখন কী ভাবে আসে তা তো কেউ বলতে পারে না। আমারও সেই দশা হলো। বেনারস থেকে ফেরবার আগের দিন হঠাৎ আমার স্ত্রীর একটু জ্বর হলো। যখন ট্রেনে উঠলুম তখন গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। একশো তিন জ্বর। ট্রেনে সারা রাত একেবারে অচৈতন্য হয়ে রইল। কলকাতায় এসে ডাক্তার দেখালুম।

ডাক্তার দেখে-শুনে ভয় পেয়ে গেল। বললে—এক্সরে করতে হবে বুকটা—

[illegible]পর এক্স-রে'তেই ধরা পড়ে গেল—টি-বি। যে-জ্বর নিয়ে [illegible]নারস থেকে সে-জ্বর আর ছাড়লো না। শয্যাশায়ী অবস্থা[illegible]র কাটলো ছ'মাস। তারই মধ্যে সুমিতার কয়েকটা চিঠি [illegible] সে-চিঠিগুলো আর দেখাতাম না আমার স্ত্রীকে। দেখা[illegible]আরো শরীর খারাপ হবে, এই ভেবে। কিন্তু শেষ [illegible] [illegible]স্ত্রী [illegible]কদিন মারা গেল।

বললুম—তারপর ?

নিরাপদবাবু বললেন—তারপর আমিই সুমিতাকে আপনার এই ঠিকানায় চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলুম যে—তোমার দিদি অমুক তারিখে মারা গিয়েছেন।

এই পর্যন্ত !

এর পর আর কোনও চিঠি সুমিতাও লেখেনি, আমিও লিখিনি। বুঝতেই পারছেন স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর কী অবস্থা হয়। যে ছিল সংসারের হাল, সেই মানুষটাই চলে গেল। আমি অফিস করবো, না সংসার দেখবো। আমি নিজের সংসার গুছোতেই ব্যস্ত হয়ে

পড়লাম। সুমিতার আর কোনও খবরই নেওয়া হয়নি। সুমিতাও আর কোনও চিঠি দেয়নি!

তারপর অফিসের কাজে আমার একটা প্রমোশন হলো। আর প্রমোশন হলেই বা কী! মাসে পনেরো টাকা মাইনে বাড়লো। তাতে আর আমার কী সুরাহা হবে। আমার ছেলে-মেয়েরা অবশ্য এখন আর নাবালক নেই। বড় মেয়ে সংসার দেখছে এখন। আর আমি এই ঘুরে ঘুরে চাকরি করে বেড়াচ্ছি। নানা জায়গায় ডিউটিতে যেতে হয় আমাকে। আজ দিল্লী, কাল ম্যাড্রাস্, পরশু পাটনা। এতে মাইনে যা-ই পাই টি-এটা বেশ মোটা মেলে। টি-এ থেকে কিছু বাঁচিয়ে আমার সংসারে সাশ্রয় করি। এবারই প্রথম বোম্[illegible] বোম্বেতে আসার অর্ডার পেয়েই ভেবেছিলুম—সুমিতা[illegible] দেখা করে আসবো। অন্ততঃ একটা কথা বলবার ইচ্ছে ছি[illegible] যে তার উন্নতিতে আমার আনন্দই হয়েছে—। তারপর একবার [illegible]কার সেন্ট্রাল রেলওয়ের হেড-অফিসে গিয়েছিলুম কাল। [illegible]র ছুটির দিন, তাই সোজা ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিলুম এখানে, ভেবে[illegible]লুম সুমিতার সঙ্গে দেখা হবে—

বললাম—এখন তো বুঝেছেন যে আগাগোড়া সবটাই মিথ্যে কথা!

নিরাপদবাবু বললেন—তা তো বুঝেছি, কিন্তু এখন কী করি বলুন তো?

বললাম—আর কী করবেন, আমি যদি তার ঠিকানা জানতুম তো আপনাকে বলতে পারতুম।

নিরাপদবাবু বললেন—তাহলে আমি আসি, আপনাকে মিছি-মিছি কষ্ট দিলুম, সুমিতাও হয়ত আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তার হয়েও আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি—

বলে ভদ্রলোক উঠলেন। যাবার সময় বললাম—যদি তার কোনও খবর কোনওদিন পান তো আমার ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়ে জানাবেন, আমি একটু নিশ্চিন্ত হবো, আমার দুর্ভাবনা রইল সুমিতার জন্যে—

তারপব ভদ্রলোক সুটকেস্‌টা নিয়ে চলে গেলেন।

নাগপুব এয়াব-পোর্টের ঘড়িতে তখন রাত তিনটে বেজে গেছে। এইবার কলকাতার প্লেন ছাড়বাব কথা। সোফার ওপর তখন সবাই বসে বসে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। শীতটা আরো জেঁকে [illegible] গরম কফি পেটে পড়ার পর শীতের দাঁত যেন আরো জোরে [illegible] ধরলো।

ব[illegible] —তারপর? নিরাপদবাবুর কাছ থেকে আর কোনও চিঠি [illegible]ছিলেন?

[illegible]খার্জি বললেন—না মশাই, বহুদিন হয়ে গেল, এখনও যখ[illegible] কোনও চিঠি পাইনি তখন মনে হচ্ছে নিরাপদবাবু আর দেখা পাননি তার। কিন্তু আব একটা ঘটনা ঘটলো এই কিছুদিন আগে। সেই ঘটনাটা বললেই আমার গল্পটা শেষ হয়ে যাবে। আপনি তো সিনেমা-লাইনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, আপনিও তো কিছু-কিছু খবর রাখেন ওদের। আপনি সেলিমার নাম শুনেছেন?

—সেলিমা?

—হ্যাঁ, বোম্বের নাকি একজন বিখ্যাত ফিল্‌ম স্টার?

বললাম—সিনেমায় আমার গল্প হয় বটে, কিন্তু সিনেমা আমি নিজে কখনও দেখি না, জীবনে কখনও স্টুডিওর ভিতরেই যাইনি। কোনও ফিল্‌ম স্টারের নামও জানি না—

মিষ্টার মুখার্জি বললেন—তবে শুনুন। ক'দিন আগে আমার এক ভাটিয়া-বন্ধু আমার হয়ে একখানা সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে এল। কী নাকি একটা ভাল সিনেমা এসেছে, সেটা দেখিয়ে আমাকে সে কৃতার্থ করবে। আমি সিনেমা দেখি না, তা সে জানে। তবু এত ভাল ছবি আমি দেখবো না এবং আমার তা ভাল লাগবে না, এ-কথা সে বিশ্বাস করতে পারে না। তাই গেলুম তার সঙ্গে। গিয়ে ছবি দেখলাম। ছবিটা আরম্ভ হলো। ছবির নাম-টাম আমার মনে থাকে না মশাই। দেখলাম খুব যুদ্ধ হচ্ছে। গান হচ্ছে আর হঠাৎ একটা মেয়ে যেই নাচতে আরম্ভ করলো সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর হাততালি। নাচটা নিশ্চয়ই খুব ভাল হচ্ছিল। নইলে [illegible] হাততালি দেবে কেন সবাই! গায়ে পোশাক-পরিচ্ছদ [illegible] কম। খানিকক্ষণ দেখবার পরই আমার কী যেন সন্দেহ হলে[illegible] সুমিতা না। ঠিক যেন সুমিতার মত চেহারা!

বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম—যে নাচছে এব নাম কী?

আমার ভাটিয়া-বন্ধু বোধহয় ভাবলে নাচটা আমার [illegible] লেগেছে। বললে—একে চেনো না? তুমি কী হে! এর নাম সেলিমা!

বন্ধু ভেবেছিল সেলিমা নামটা শুনলেই আমি চম্‌কে উঠবো! কিন্তু তখনও আমার দৃঢ় ধারণা এ সুমিতা ছাড়া আর কেউই নয়!

জিজ্ঞেস করলাম—এটা কি এর সিনেমার নাম, না বাপ-মায়ের দেওয়া নাম?

বন্ধু বললে—তা জানি না। তবে সিনেমায় নেমে অল্পদিনেই খুব নাম করেছে। খুব টাকা উপায় করছে, বোম্বেতে একটা বাড়িও কিনেছে—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা তুমি খোঁজ নিয়ে আমাকে একবার জানাতে পারো যে এ বাঙালী কিনা? কালকেই আমাকে জানাবে।

পরের দিনই আমার ভাটিয়া-বন্ধু খবর নিয়ে আমাকে টেলি-ফোন করে জানালে যে সেলিমা বাঙালী নয়। খাস দিল্লীর মুসলমানী মেয়ে। খুব খান্‌দানী বংশের মেয়ে। লখ্‌নৌ থেকে নাচ শিখেছে। বিলেতেই কেটেছে ছোটবেলাটা। এখন বড় হয়ে সিনেমায় নেমেছে।

কি জানি আমার কিন্তু বিশ্বাস হলো না। সুমিতা যা মেয়ে, তার পক্ষে রাতারাতি মুসলমানী বলে নিজেকে চালানো মোটেই অসম্ভব নয়। সে মেয়ে সব পারে। দরকার হলে মুসলমান কেন, ক্রীশ্চান হতেও তার বাধা নেই।

আমার প্লেন ছাড়বার ঘোষণা হলো মাইক্রোফোনে। আসবার সময় মিস্টার মুখার্জি বললেন—তারপর থেকে ঠিক করেছি আর কেউ অনুরোধ করলেও আমার লেটার-বক্স আর কাউকে ব্যবহার করতে দেব না।

মিষ্টার মুখার্জির কাছে এ-গল্প যেদিন শুনেছিলাম, তার পর অনেক দিন কেটে গেছে। এ-গল্প নিয়ে অনেক ভেবেছি। তারপর বম্বে শহরেও আরো অনেকবার গিয়েছি। অনেকবার সেখানে রাস্তায় যেতে যেতে অনেক মেয়ের মুখের দিকেও চেয়ে দেখেছি। সকলের জীবনের সব রহস্য জানবার চেষ্টা করেছি, ভেবেছি এই রকম কত জীবন কত আকাঙ্খা নিয়ে আমাদের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলের সব রহস্য সব সমস্যার সমাধান যদি করতে পারতুম। ভেবেছিলাম যদি কোনওদিন সময় সুযোগ পাই তো সুমিতাদের কাহিনী লিখবো। কিন্তু সে-সব লেখা আর হয়ে ওঠেনি। কিম্বা হয়ত অন্য কোনও গল্প এসে সুমিতার গল্পকে চাপা দিয়ে দিয়েছে,

গল্পের পর গল্প এসে ভিড় করেছে মাথায়। কখনও নোট্ লেখার অভ্যেস নেই, ডায়েরীও রাখি না। একবার ভুলে গেলে তা মুছে যায়, নিভে যায়, ছাই হয়ে যায়। তখন আর তাকে খাতার পাতায় উদ্ধার করতে পারি না।

সুমিতার গল্পও এমনি হয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

মন বড় বিচিত্র যন্ত্র। কোন্‌টা সে মনে রাখে, এবং কেন মনে রাখে, আবার কোন্‌টা সে ভুলে যায়, কোন্‌টা ভুলতে সে ভালবাসে তার ব্যাখ্যা বড় শক্ত। মনেব হদিস মনস্তত্ত্বাবিদরাও পায়নি। মনকে যদি কেউ বশে আনতে পারলো, তো তার হয়ে গেল। তার মোক্ষ হয়ে গেছে। সে তখন পরম পুরুষ।

অনেক সময় অনেক লোক এসে দেখা করে, দরবার করে।

বলে—আমাকে নিয়ে গল্প লিখুন—

মন কি ক্যামেরা যে তোমার ছবি তুলে নিলাম একটা সুইচ্ টিপে আর সব দেখা হয়ে গেল। মনের ভেতরেও যে এক মন থাকে, তার ভেতরেও আর একটা মন। সে অবাঙ-মানস[illegible] সে দুর্জ্ঞেয়। আজ পর্যন্ত অনেক যন্ত্র বেরিয়েছে। কিন্তু মন জানবার যন্ত্র বেরোয়নি। বেরোবেও না। বেরোলে পৃথিবীতে খুনোখুনি মারামারি কাটাকাটি বেধে যাবে। এমন যে মন তাকে না জানতে পারলে তোমাকে নিয়ে গল্প লিখবো কেমন করে? আর তা ছাড়া তোমার নিজের মনকে কি তুমি নিজেই জানো? নিজেকে যদি না জানো তো অন্যকে জানাবে কেমন করে? আর তোমার জানাই যে সঠিক জানা তাই-ই বা বুঝবো কী করে? পাশাপাশি একসঙ্গে একঘরে এক সংসারে বাস করে, প্রতিদিন এক বিছানায় শুয়েও একজন স্বামী একজন স্ত্রীকে চিনতে পারে না। হঠাৎ সেই সংসারে চল্লিশ বছর পরে একদিন একজন আর একজনকে বলে ওঠে —তোমাকে আমি চিনতে পারিনি।

এই রিপন চৌধুরীর কথাই ধরা যাক।

আমার জানা এক বন্ধুর মুখে রিপন চৌধুরীর কথা আমি শুনেছিলাম। আমার বন্ধুটি এ্যাড্‌ভোকেট। রিপন চৌধুরীর গল্পটা তার মুখেই যেমন শুনেছিলাম তেমনি বলি—

আমার বন্ধু গল্প-লেখক নয়। তাই তার মুখে আমার ভাষা বসিয়ে দিলাম। এবার নায়িকা নয়, নায়কের গল্প। রিপন চৌধুরীদের চেনা কি অত সহজ!

আমি একজন জুয়াড়ীকে জানতাম। জুয়াই যার জীবিকা। আজীবন যৌবন নিয়ে, জীবন নিয়ে, অর্থ নিয়ে কেবল জুয়াই সে খেলে এসেছে। কিন্তু একটা বিষয়ে সে ছিল একনিষ্ঠ। ভালবাসার ব্যাপারে সে জুয়াতে বিশ্বাস করতো না। তার কাছে মানুষের স[illegible] আর কিছুর মূল্য থাক আর না থাক, মূল্য ছিল [illegible]বাসা[illegible]। কিন্তু এ খবর জানতে পারলাম অনেক পরে। যখন সে মারা গেছে। সেই গল্পটা বলি :

বিলাসপুরে মাত্র একদিন ছিলাম। সেই একদিনের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

বিলাসপুর সিটির উকিল সাহেব রণধীর চৌহান লিখেছিলেন—'একটা মামলা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার। কাটনি থেকে ফেরবার পথে এখানে একদিনের জন্যে নামবেন—'

তা চৌহান সাহেবের সে অধিকার আছে। কলকাতায় যখনই তিনি এসেছেন, আমার মামলার নথিপত্র অনেকবার তাঁকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছি। যুদ্ধের সময়ে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন ও-দেশের খাঁটি ভয়সা ঘি, আমি তাঁকে পাঠিয়েছি বাঙলাদেশের

নলেন-গুড় আর পটোল। সুতরাং তাঁর বাড়ীতে আতিথ্যস্বীকার করা বিশেষ বড় কথা নয়।

ষ্টেশনে নামতেই চৌহান সাহেবের খাস্ মুন্সী আমায় অভ্যর্থনা করলে।

চৌহান সাহেবের গাড়ীতেই রেল-সেট্‌লমেন্ট পেরিয়ে শনিচরী বাজারের পাশ দিয়ে সিটিতে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

লোকজন মক্কেল ছিল অনেক। তবু চৌহান সাহেব উঠে এলেন।

বললেন—আজ গাড়ীটা তাহ'লে ঠিক সময়ে এসেছে দেখছি।

বললাম—সিটি'র একজন মিনিষ্টার ছিল গাড়ীতে—লেট হবার জো আছে?

হেসে উঠলেন চৌহান সাহেব। বললেন—তাহ'লে রোজ প্রত্যেক গাড়ীতে একটা ক'রে মিনিষ্টার চাপিয়ে দিলেই হয়—সব গাড়ী রাইট টাইমে আসবে।

পাশেই একজন বসেছিলেন। দিব্যি স্যুটপরা চেহারা কম বয়েস।

চৌহান সাহেব তার দিকে চেয়ে বললেন—তাহ'লে তুমি এস, আমি যাবোখন সন্ধ্যেবেলা—

আমি চেয়ে দেখলাম ছেলেটির দিকে।

ছেলেটিও আমার দিকে চেয়ে নিয়ে বললে—আপনার এই বন্ধুকেও তাহ'লে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন ভকীল সাহাব।

চৌহান সাহেব বললেন—তা বেশ তো, যাওয়া যাবে।

ছেলেটি বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে চৌহান সাহেবের একজন বিশিষ্ট বন্ধু আমি।

আমি বললাম—ব্যাপার কি?

চৌহান সাহেব বললেন—ও হলো ওঙ্কার চৌধুরী—ওর বাবা ছ'মাস আগে মারা গেছেন। তিনি লিখে গিয়েছিলেন, ছ'মাস পরে

তাঁর উইল যেন পড়া হয়, তার আগে নয়—আজ ছ'মাস পুরো হলো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করেছে—বাইজী-টাইজী আসবে, নাচ হবে, গান হবে, তোমার যেতে আপত্তি কিসের, ওর বাবা আমার খুব বন্ধু ছিল কিনা, আমি না গেলে চলবে না—আমিই ওর বাবার উকীল ছিলাম।

ছেলেটি হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বললে—আমরাও বাঙালী, ভকীল সাহাব।

চৌহান সাহেবও বলে উঠলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক কথা—ওর বাবাও যে বাঙালী, তোমাদের কলকাতার লোক।

কথাটা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগলো। বাবা বাঙালী, ছেলে তবে কি ছত্রিশ-গড়িয়া! চেয়ে দেখলাম আবার ছেলেটির দিকে। কানে হীরের টাব্। চুল তেল-চপ্‌চপে ক'রে পাতাকাটা সিঁথি। মুখে কেমন যেন একটা রুক্ষ ভাব।

চৌহান সাহেব আবার বললেন—তুমি ওর বাবাকে চিনলেও চিনতে পারো, কুড়ি বছর আগে কলকাতায় ছিল। খুব পয়সা-ওয়ালা লোক—

বললাম—কী নাম ?

—রিপন চৌধুরী!

রিপন চৌধুরী! কতরকম লোকের সঙ্গেই সারা জীবন মিশতে হয়েছে। কত বিচিত্র জীব সব। ওকালতি ব্যবসার প্রথম দিনটি থেকে কত নথিপত্র জমে জমে উঠেছে তাকে। কত নটবর, কত রাধারাণী, কত পাঁচুবালা, কত তিনকড়ি। আমার মোক্তার মুহুরীদেরও মনে থাকবার কথা নয়, সব নাম। নাম সম্বন্ধে আমার আবার স্মৃতিশক্তির একটু দুর্বলতাও আছে বোধহয়। তাছাড়া নাম সম্বন্ধেই বোধহয় মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। কারোর নাম না মনে রাখলে বোধহয় লোকে অপরাধ নেয়। খাঁয়ে খাসে

বা কোর্টে অনেক মক্কেলের নাম মনে না থাকাতে অনেকবার বেশ বিব্রত হতে হয়েছে। অনেকবার চেনামুখ দেখে চিনতে পেরেও নাম মনে করতে পারিনি। কেউ হয়ত অনেকক্ষণ কথা বলার পর বলেছে—চিনতে পারছেন ?

আমি বলেছি—চিনতে পেরেছি, কিন্তু নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না।

চোখমুখ দেখে বুঝেছি, নাম মনে না রাখার জন্যে অসন্তুষ্টই হয়েছে। চরিত্রের এ-দিকটার আর সংশোধন হয়নি।

চৌহান সাহেব তখনও বলে চলেছেন—ওঙ্কার চৌধুরী আমাদের ভারি ভালো ছেলে, বুঝলে।

ওঙ্কার চৌধুরী এবার উঠলো।

বললে—আপনারা দুই বন্ধুতে যাবেন তাহলে—আপনারা না গেলে বিশেষ দুঃখিত হবো।

ছেলেটি চলে যাবার পর চৌহান সাহেব বললেন, বিপন চৌধুরীর ওই একমাত্র ওয়ারিশান কিনা—প্রায় দুই-তিন [illegible] রেখে গেছে বুড়ো—সব ও পাবে।

একসময় মক্কেলরাও একে একে সব উঠে গেল। চৌহান সাহেবের সঙ্গে তাঁর মামলার নথিপত্র নিয়ে কিছুক্ষণ পরামর্শ হলো। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে চৌহান সাহেব কোর্টে চলে গেলেন। আমার দিবানিদ্রার ব্যবস্থা হয়েছিল। চারি-দিকের জানলা দরজা বন্ধ করে বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি। উন্‌কি পোকার উপদ্রব কমেছে। দিনের বেলাতেই রাতের মতন অন্ধকার। পূর্ণ গতিতে পাখা চলছে। বাইরের থম্‌থম্‌-এর আবরণে বেশ নিদ্রা আসছিল চোখ জুড়ে। সারারাত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে বিশ্রামেরও প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠেছি!

রিপন চৌধুরী! নামটা তো আমার পরিচিত!

সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটাও চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এতদিনের ওকালতি ব্যবসাতে অমন একটা চেহারা আগে আর কখনও দেখিনি। পরেও হয়ত দেখবো না! রিপন চৌধুরী! সমস্ত মুখে বসন্তের দাগ। চোখের ওপরকার পাতা দুটো একটু বেশি মাত্রায় ভারি। চোখটা যেন আধঢাকা। আর সেই কটা চাউনি! শরীরের ওজন তিনমণ বোধহয়। দামী স্যুটপরা চেহারা।

প্রথম যেদিন এসেছিল রিপন চৌধুরী, সেই দিনই চমকে উঠেছিলাম।

চুরুট মুখে গাড়ী থেকে নেমে থপাস্ থপাস্ করতে করতে এসে বসেছিল আমার টেবিলের সামনে। সঙ্গে ছিল আর একজন লোক। তার নাম বিনয় পালিত। দু'জনেই মহা সৌখীন। কথায় ওস্তাদ। কিন্তু আমি তখন রিপন চৌধুরীর দিকেই হাঁ ক'রে চেয়েছিলাম। পাকা জুয়াড়ীর মত চেহারা ঠিক!

চেয়ারে বসেই হাঁফাতে লাগলো ভদ্রলোক।

বিনয় পালিত বললে—একটা মামলায় আমরা ফেঁসে গেছি দু'জনে—একটা ব্রিফ নিতে হবে।

বললাম—কিসের মামলা?

—ফৌজদুরী।

—কোন কোর্টে?

উত্তর দিলে রিপন চৌধুরী। বললে—মামলাটা খুব সহজ ব্যাপার। এমন হরদমই হচ্ছে, কলকাতা শহরে গাড়ী-বাড়ী-বউ নিয়ে বাস করতে গেলে এমন হরদমই হয়, তার জন্যে কিছু নয়, এমন মামলায় জীবনে অনেকবার ফেঁসেছি—কিন্তু আপনার কাছে আসা অন্য কারণে—

কথা বলতে রিপন চৌধুরীর যেন কষ্ট হচ্ছিল। খানিকটা মোটা শরীরের জন্যে, আর খানিকটা গরমের জন্যে। মনে আছে সেটা গ্রীষ্মকাল।

জিজ্ঞেস করলাম—'আপনারা কি দু'জনেই আসামী?

বিনয় পালিত বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ফরিয়াদি কে?

—ফরিয়াদি হলো আমার বিশেষ বন্ধু, পাটনার মনোহর বোস—দু'জনের এত বন্ধুত্ব, অনেকদিনের জানাশোনা, সেই মনোহর কিনা আমাদের নামে মামলা করলে মশাই, আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, তার বাড়ীতে আমি তিনমাস কাটিয়েছি, আমার বাড়ীর মেয়েছেলেদের সঙ্গে তার বাড়ীর মেয়েছেলেদের এত ভাব—সেই মনোহর বোস শেষকালে—

রিপন চৌধুরী ধমক দিলে আবার বিনয় পালিতকে—তুই থাম্ বিনয়। মামলা অমন করেই থাকে লোকে—শহরে বাস করতে [illegible] কোনও ভদ্রলোক মামলা এড়িয়ে চলতে পারে না—[illegible] করলেই যে জিতবে তার কি মানে আছে?...

সেই বহুদিন আগেকার দৃশ্যটা চোখের সামনে যেন আবার ভেসে উঠতে লাগলো। চেহারা দেখে মনে হলো কলকাতা শহরের দুটি ঘুঘু লোক যেন ভদ্র সাজপোশাকে আমার সামনে বসে আছে।

বিনয় পালিত বললে—ব্যারিষ্টার কে সিন্‌হাকে চেনেন?

বললাম—চিনি, কেন?

তিনিই আমার ষ্ট্যাণ্ডিং ব্যারিষ্টার, হঠাৎ তিনি বিলেতে চলে গেছেন চেঞ্জে—তাই মুস্কিল হয়েছে—এখন আপনাকে ব্রিফটা নিতে হয়।

—কেসটা কার কোর্টে?

বিনয় পালিতের চেয়ে রিপন চৌধুরীর দিকেই আমি বারবার চেয়ে দেখছিলাম। এমন চাঁছা-ছোলা চেহারা। বেশি কথা বলে না। একটানা চুরুট টেনে চলেছে নির্বিবাদে। দেখে মনে হয় দু-পয়সা আছে ব্যাঙ্কে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কি করেন ?

রিপন চৌধুরী বললে—আমি বুক-মেকার।

আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে দেখে আরো বুঝিয়ে বললে—রেস্ কোর্সের বুক-মেকার—আর বিনয় আমার পার্টনার।

খানিক পরে কাগজপত্র তৈরি হবার পর দু'জনে চলে গেল। জানলা দিয়ে দেখলাম, বিনয় পালিত গিয়ে সামনের সিটে বসলো আর রিপন চৌধুরী স্টিয়ারিং ধরে একটা চুরুট ধরিয়ে মটরে স্টার্ট দিলে। মটরটা চলে যাবার পরেও খানিকক্ষণের জন্যে ঘরটা যেন কেমন থম্ থম্ করতে লাগলো।

[illegible]মার জুনিয়র বসন্ত এতক্ষণে মুখ খুললে।

—ও[illegible] চিনতে পারলেন স্যার ?

বললাম—চেনো নাকি তুমি ?

—ওরই নাম রিপন চৌধুরী - নাম শোনেননি ওর ? সেদিন চৌরঙ্গীতে তিন-তিনটে সার্জেন্টকে চাপা দিয়ে বেমালুম গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল—কেউ ধরতে পারলে না, আর সেদিন ক্যারাভান্-এ ঢুকে রাত তিনটে পর্যন্ত বোতলের পর বোতল কেবল হুইস্কি খেয়ে একটা 'বয়'কে প্রায় মেরে ফেলেছিল—

বললাম –টাকাকড়ি আছে বুঝি খুব ?

বসন্ত বললে—আজ্ঞে ওই তো ছিল ইওথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—লালবাতি কি সাধে জ্বাললে ব্যাঙ্কটা—শহরের সব লোকের সঙ্গে ভাব রেখেছে। পুলিস কমিশনার থেকে মিনিষ্টার পর্যন্ত সবাই যে ওর হাতধরা লোক।

পরের দিন বসন্ত এসে বললে—আপনার ক্লায়েন্টকে দেখলাম আজ এখুনি।

—কোথায়?

—এইতো লোয়ার সারকুলার রোডের ঠিক মোড়ে, একটা ভীষণ য়্যাকসিডেণ্ট করেছে—বাসের সঙ্গে এমন ধাক্কা লাগিয়েছে—কিন্তু আশ্চর্য জান্ মশাই, আমি ছিলাম পেছনের বাসে, ভাবলাম গেল বুঝি থেঁতলে—বাসসুদ্ধ সবাই চীৎকার করে উঠেছি—কিন্তু—

কিন্তু দু একদিন বাদেই আবার একদিন সশরীরে এসে হাজির। এবার আর-একটা নতুন গাড়ী।

বললে—কাল তো হিয়ারিং আছে, না?

সেই নির্বিকার মুখ। চুরুট মুখে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা।

বসন্ত বললে—সেদিন মটর য়্যাকসিডেণ্ট-এ আপনি খুব বেঁচে গেছেন!

রিপন চৌধুরী চুরুটের ছাইটা ঝাড়লে।

বসন্ত বললে—গাড়ীটার কি হলো?

রিপন চৌধুরী ওর দিকে না চেয়েই জবাব দিলে—ওটা তো ইনসিওর করা ছিল। আর গাড়ীটাও পুরনো হয়ে গিয়েছিল—আমারই দোষ—মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল সেদিন—

কোর্টে যেতেও সেদিন অনেকে জিজ্ঞাসা করলে। সবাই জেনে গেছে। ফরিয়াদির পক্ষে দাঁড়িয়েছিল এক বন্ধু। বললে—রিপন চৌধুরীর ব্রিফটা তুমি নিয়েছ নাকি?

বিনয় পালিত সেদিন সন্ধ্যেবেলা একলা এল।

গলা নিচু ক'রে বললে—কিছু যদি মনে না করেন তো আপনাকে একটা কথা বলবো স্যার!

কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তবু হাতের কাগজগুলো সরিয়ে দিয়ে বললাম—না, বলুন—

—রিপনকে যদি জিতিয়ে দিতে পারেন তো আপনার·········

আমার চোখমুখ দেখে বিনয় পালিত যা বলতে যাচ্ছিল তা আর মুখ দিয়ে বেরুল না।

বললাম—ব্রিফ যখন নিয়েছি তখন যথাসাধ্য আমি করবো—বেশি বিরক্ত করবেন না।

বিনয় পালিত বললে—না, তাই বলতে এসেছিলাম—কাকে ধরলে কাজ হয় যদি ব'লে দিতেন তো একবার চেষ্টা করে দেখা যেত—ওর তো সকলের সঙ্গেই জানাশোনা আছে—রেসের মাঠে তো সব মিয়াকেই আসতে হয়।

কি জানি মক্কেল হলেও প্রথম থেকেই যেন লোকটাকে ঘৃণা করতে স্থুরু করেছিলাম।

বিনয় পালিত বললে—রিপন যে খুব বড় বংশের ছেলে কিনা—ওর কাকা বরোদার রাজার······

জুনিয়র বসন্তও বললে—শুনেছি নাকি লোকটা তিনবার বিলেত ঘুরে এসেছে স্যার—

বললাম—কি করতে গিয়েছিল ?

—তা কে জানে—থাকে এখানে সাহেব-পাড়ায়—আজকে সব খবর নিলাম যে—লোকটা নাকি আজ সাত বচ্ছর স্রেফ মাংস খেয়ে বেঁচে আছে, ভাত নয়, রুটি নয়, স্রেফ মাংস খেয়ে-খেয়েই ওইরকম চেহারা!

দু-একদিনের মধ্যেই জানা গেল আমার অনুমান ভুল নয়। রিপন চৌধুরীকে কলকাতা শহরের রুই-কাতলা থেকে চুনো-পুঁটি পর্যন্ত সবাই চেনে। জাঁহাবাজ লোক বলে নয়—অসাধ্য সাধন করতেও ওস্তাদ। কোনও হোটেল, কোনও বিজনেস ফার্ম, কোনও হাই-সোসাইটি বাদ নেই, সব মহলেই ঘোরাফেরা করে। ঠিক রাজনীতিতে না থাকলেও সে-মহলের নেতারা ওর হাতের মুঠোর মধ্যে। রিপন চৌধুরীর একটা কথার জোরে একটা চাকরি হয়

আবার চাকরি যায়ও। রেসের বুক-মেকার অবশ্য বাইরে—কিন্তু ভেতরে ভেতরে নানা ফন্দি ফিকির-এ ঘোরে। রহস্যজনক উপায়ে প্রচুর পয়সা করে, আবার দেদার পয়সা উড়োয়। ওর কাছে স্যুট বদলানোও যা আর মটর গাড়ী পাল্টানোও তাই। বছরে ছ'মাস যা থাকে কলকাতায়, আর ছ'টা মাস কখনও দার্জিলিং, কখনও কায়রো, কখনও কাশ্মীর আবার হয়ত একদিনের জন্যে হুট ক'রে চলে এল কলকাতায়।

প্রথম যখন চেকটা দিলে একটু সন্দেহ ছিল। ব্যাঙ্কে টেলিফোন করলাম—চেকটা সত্যিই ক্রেডিট হয়েছে কিনা।

ক্রেডিট হয়েছে শুনে আশ্বস্ত হলাম বটে। কিন্তু হিয়ারিং-এর আগের দিন হঠাৎ টেলিফোন এল রিপন চৌধুরীর কাছ থেকে।

বললাম—কে?

—রিপন চৌধুরী স্পিকিং—কালকে আমি কোর্টে হাজির হতে পারবো না।

—কেন?

—ইন্‌ডিস্‌পোসড্, শরীরটা খারাপ আর কি, ইজ দ্যাট অল রাইট? আমি মেজর দে'র সার্টিফিকেট পাঠাচ্ছি।

জামিনে খালাস পাওয়া আসামী। তবু যেন সন্দেহ হলো। পালাবার মতলব নাকি! সেদিন দিন নিলাম।

প্রসিকিউসনের উকীল বন্ধু বললে—কি হে, তোমার ক্লায়েন্ট কোথায়?

অবশ্য জামিন ছিল অন্য লোক। সেদিক দিয়ে আমার কোনও ভয় ছিল না। তবু জানতাম রিপন চৌধুরী যে-ধরনের মানুষ তাতে সব সম্ভব। মামলাটা অবশ্য সহজ। জুনিয়র বসন্ত কেস্‌টাকে বেশ গুছিয়ে লিখে ফেলেছিল।

কেসটার ঘটনা সোজাসুজি এই—

পাটনার ব্যবসাদার মনোহর বোসের সঙ্গে বিনয় পালিতের বহুদিনের বন্ধুত্ব। বিনয় পালিতের সঙ্গে মনোহর বোসের সঙ্গে খুব ভাব। বাড়ীর ভেতরে আনাগোনা ছিল বিনয় পালিতের। বিনয় পালিত তখন পাটনার কনট্রাকটর।

সেই মনোহর বোসের ছেলে অরুণ বোস চাকরি পেয়েছে এয়ার ফোর্সে। বড় অফিসার। কম বয়েস। বিয়ে হয়নি। একমাসের ছুটিতে দু-একদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছিল। এসে এক বড় হোটেলে বসে খাচ্ছে, এমন সময় দেখা বিনয় পালিতের সঙ্গে—

বাবার বন্ধু। অরুণ নমস্কার করলে।

বিনয় পালিত বললে—এখানে কোথায়, বাবা?

তারপর সব শুনে বললে—বেশ বেশ, তা তুমি আমার ওখানে ওঠোনি কেন?

অরুণ বোস বললে—মাত্র দু'একদিনের জন্যে এসেছি।

—সে শুনছি না, তোমার বাবা আমার বন্ধু—আর তুমি কিনা হোটেলে উঠবে—

তারপর বিনয় পালিত পাশে-বসা রিপন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললে—এ মনোহরের ছেলে হে—আমাদের পাটনার মনোহর--

রিপন চৌধুরীও দু-চার কথা বললে। এখন এয়ার ফোর্সের মেজর রামলিঙ্গাপ্পা রিপন চৌধুরীর বিশেষ বন্ধু, তাও বললে। রয়েল এয়ার ফোর্সের বড় বড় হোমরা-চোমরা অফিসারদের সব্বাইকে রিপন চৌধুরী চেনে দেখা গেল। শুধু চেনাই নয়, জানা গেল, কারো সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছে, কেউ পাড়ার লোক, কেউ বিলেতের বন্ধু, কেউ আত্মীয়। ইচ্ছে করলে রিপন চৌধুরী হোমরা-চোমরাদের একটু মুখের কথা বলে প্রমোশনের সুবিধেও করে দিতে পারে।

বেশ ভাব জমে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

রিপন চৌধুরী বললে—চলো বাবা, আমার ফ্ল্যাটেই চলো আজকে—রাত্তিরের খাওয়াটা আমার ওখানেই সেরে আসবে।

অরুণ জানতো না অবশ্য যে বিনয় পালিতের তখন টাকার টানাটানি চলছে। রিপন চৌধুরীরও কিছু টাকার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

সাহেব-পাড়ায় রিপন চৌধুরীর ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে খানাপিনা হলো।

বিনয় পালিত বললে—এসো বাবা এক হাত ব্রিজ খেলা যাক্—বাইরে যা বিষ্টি এখন কোথায় যাবে—

ব্রিজ থেকে কিটি, কিটি থেকে রামি, রামি থেকে ফ্ল্যাশ। প্রথমে অল্প পয়সায়। প্রথম প্রথম অরুণ বোস বেশ দু-পয়সা হাতিয়েও নিলে।

বিনয় পালিত বললে—এ সুবিধে হচ্ছে না—ষ্টেক্ বাড়াও—

বাড়াও তো বাড়াও!

অরুণের রোখ বেড়ে গেছে। দু'দান এলো দু'দান গেল। রাত বাড়তে লাগলো।

নির্বিকার চিত্তে খেলে চলেছে রিপন চৌধুরী।

রাত তখন দুটো। বিনয় পালিত বললে—আর নয়—বড্ডো হেরেছি—তিন হাজার টাকার মতন—

সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন।

অরুণ বোস হিসেব করে দেখলে—প্রায় পনেরো হাজার টাকার মতো হার—

কোথা দিয়ে নেশার মতো সময় কেটে গেছে টের পাওয়া যায়নি। অরুণ একটা চেক লিখে দিলে, অত রাতে তা ভাঙানোই বা যাবে কোথায়।

বিনয় পালিত বললে—আমার একজন জানাশোনা লোক আছে, দেবে ভাঙিয়ে—

সেই রাত্রে কোথা থেকে কিছু টাকা লোকসান দিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে এল চেক।

এক রাত্রের মাত্র ঘটনা, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা থেকেই প্রলয় ঘটে গেল। মনোহর বোসের কাছে খবর যেতেই সে রেগে লাল। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর শেষে এই কাজ! কোর্টে মামলা রুজু হয়ে গেল। আসামী রিপন চৌধুরী আর বিনয় পালিত। অল্পবয়েসের ছেলেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাপের বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে রাহাজানি! সঙ্গে সঙ্গে সমন বেরুল ওদের নামে। জামিনে খালাস হলো দু'জনে।

শেষকালে মামলার শুনানির দিন ঘনিয়ে এল।

আমার উকীলবন্ধু সেকালপন্থী লোক। জেরায় জেরায় আসামীকে রাগিয়ে দিয়ে কথা আদায় করবার পক্ষপাতী। আধুনিক উকীলেরা যেমন সংযমী ধীর স্থিরভাবে জেরা করে, তার সে পথ নয়। আমার কিন্তু বেশ মজা লাগছিল। আমার কেবল মনে হচ্ছিল—দেখা যাক রিপন চৌধুরীকে রাগান যায় কিনা। বিচলিত হয় কিনা সে। কিন্তু রিপন চৌধুরীকে রাগাতে গিয়ে আমার বন্ধুই বারবার রেগে-মেগে চীৎকার করে উঠছিল। রিপন চৌধুরীকে প্রথম দিনটি যেমন দেখেছি, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও ঠিক তেমনি শান্ত দেখলাম। এতটুকু উত্তেজিত হবার লক্ষণ নেই মুখে। রিপন চৌধুরী নিজের সমর্থনে বললে—আমার কি দোষ! খেলার জন্যেই খেলা হয়েছিল। কেউ তাকে জোর-জবরদস্তি করে খেলায়নি। খেলায় হার-জিত আছেই। আর হার-জিতই যদি না থাকবে তো খেলতে বসা কি জন্যে। খেলার সৃষ্টিই বা হয়েছে কেন! তাছাড়া···

কিন্তু ঘটনাচক্র ছিল সমস্তই রিপন চৌধুরীর বিপক্ষে।

ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ও দিলে বিপক্ষে। কাঁচা বয়েসের ছেলে পেয়ে দু'জন ঘুঘু পাকা ঝানু জুয়াড়ী টাকা কামিয়ে নিয়েছে। এর মূলে ছিল ষড়যন্ত্র। দু'জনে বন্ধুর ছেলেকে শুষে নিয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদী জেল হয়ে গেল দু'জনের।

মামলার পর রিপন চৌধুরী আর বিনয় পালিতকে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশের লোক। আমি চলে আসছিলাম।

জুনিয়র বসন্ত হঠাৎ আমার পেছনে এসে ডাকলে—স্যার, রিপন চৌধুরী আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়—

সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে আসামীর সঙ্গে আমি দেখাসাক্ষাৎ করি না। কিন্তু সবসময় না করে উপায় থাকে না

গেলুম আবার।

দু'পাশে দু'জন পুলিশ-সার্জেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু রিপন চৌধুরীর তেমনি সুস্থ স্বাভাবিক চেহারা। একটু আগেই যে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে তা দেখে বোঝা যায় না। দু'চোখের ওপরকার পাতাদুটো তেমনি ভারি তেমনি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দু'চোখে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে রিপন চৌধুরী বললে—আমি আপীল করতে চাই, এখুনি ব্যবস্থা করুন—

আমি বললাম—কিন্তু আপীল করে তো কিছু লাভ হবে না আপনার—

—তা হোক, আপীল আমি করবই; আপীল করে দিন আপনি।

আবার বললাম—সাক্ষী-সাবুদ সবই আপনার বিপক্ষে—আমি বলছি সুবিধে হবে না আপনার মিষ্টার চৌধুরী।

বলে চলে আসছিলাম।

কিন্তু পেছন ফেরবার আগেই রিপন চৌধুরী ডাকল আমায়। —শুনুন!

সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম—কি?

—আপনি টাকার জন্যে ভাববেন না, যত টাকা লাগে—

বললাম—টাকার জন্যে বলছি না—টাকা আপনার যাবে, তাতে আমার কি বলবার আছে—

রিপন চৌধুরী বললে—কিন্তু আমি একটা বিশেষ কারণেই আপীল করতে চাইছি। কারণ—

—কি কারণ বলুন।

রিপন চৌধুরী বললে—আমার এক ছেলে আছে, সিঙ্গাপুরের গোর্খা রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন। তার জন্যেই আমার আপীল করা দরকার—আমার জেল হলে তার বন্ধুদের কাছে সে মুখ দেখাতে পারবে না লজ্জায়—তার জন্যেই বলছি—

আমি কেমন একটু হতবাক হয়ে গেলাম। পুত্রস্নেহ! যে রিপন চৌধুরীকে জানি তার মুখ থেকে কথাটা শুনলে যেন বিশ্বাস হবার নয়। শেষকালে রিপন চৌধুরীরও কিনা পুত্রস্নেহ!

ভালো করে চেয়ে দেখলাম মুখের দিকে। সেই ভাষাহীন মুখ। যদি কোনো ভাষা সে মুখে খুঁজে পাওয়া যায় তো সে অনাসক্তির অবিচলিতচিত্ততার। মনে হলো নিশ্চয় মিথ্যাকথা বলছে। আমার সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। আসামীদের কাছ থেকে এরকম মিথ্যে উক্তি বহুবার শুনেছি। এটা আর বিস্ময় বা বিরক্তি কিছুই উদ্রেক করে না। তবু যদি একটু বিচলিত হয়ে থাকি তো সে রিপন চৌধুরীর জন্যেই।

শেষপর্যন্ত আপীল করাই সাব্যস্ত হলো।

কারণ জুনিয়র বসন্তকে দিয়ে খবর নিয়ে জেনেছিলাম, সত্যিই রিপন চৌধুরীর এক ছেলে আছে। একমাত্র ছেলে। যুদ্ধে গেছে সে। সিঙ্গাপুরে আছে এখন। রিপন চৌধুরীর একবর্ণও মিথ্যে নয়।

কিন্তু আপীলেও বিশেষ কিছু সুবিধে হলো না।

প্রসিকিউসনের উকীল আসামীকে জেরায় আবার নাস্তানাবুদ করে দিলে। রিপন চৌধুরীও তেমনি নির্বিকারভাবে সব কথার জবাব দিয়ে গেল। আমার মাথাতেও তেমন কোনো অকাট্য যুক্তি এলো না, নইলে হয়ত মামলার দাঁড়িপাল্লা অন্যদিকে ঝুঁকে পড়তো। বিচারকের রায়ে নিচের কোর্টের রায় বহাল হয়ে রইল। আমারও তখন বয়েস কম ছিল। একটু হয়ত ভাবপ্রবণ ছিলাম। রিপন চৌধুরীর ছেলের কথা ভেবে তার জন্যে যে একটু দুঃখ না হচ্ছিল তা নয়। অবশ্য আশা-ভঙ্গ হওয়ার মত কিছু ব্যাপার নয়। কারণ রিপন চৌধুরীর বিপক্ষে যুক্তিগুলো ছিল তীক্ষ্ণ।

কোর্ট থেকে যথারীতি সেদিনও বেরিয়ে আসছিলাম।

কিন্তু কি জানি কি মনে হলো, আবার পেছন ফিরলাম। ওর ছেলের কথা ভেবে মনে হলো যেন কিছু বলা দরকার। তখন দু'জন সার্জেন্ট রিপন চৌধুরী আর বিনয় পালিতকে ধরে নিয়ে চলেছে।

যেতেই দু'জনে আমার দিকে চাইলো।

একটা যেন কৈফিয়তের সুরেই বললাম—দেখলেন তো মিষ্টার চৌধুরী, আমি বলেছিলাম—আপীলেও কোনো ফল হবে না!

রিপন চৌধুরী বললে—এখন বুঝছি আপীল না করলেই ভালো হতো।

নিজের যুক্তির অকাট্যতা রিপন চৌধুরীর কাছে এত সহজে প্রমাণ করতে পারব ভাবিনি। উত্তর শুনে একটু আত্মপ্রসাদই লাভ করেছিলাম।

রিপন চৌধুরী আবার বললে—তাছাড়া এখন জেলে যাওয়াতে কিছু আর এসে যায় না।

মুখের দিকে আর একবার চেয়ে দেখলাম। কিন্তু রিপন চৌধুরীর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারা প্রায় একরকম অসম্ভব ব্যাপার। সে মুখের কোনও রেখার কোনও রকম পরিবর্তন যেন হতে নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন ?

—আমার ছেলে মারা গেছে !

নিজের বিস্ময়কে চাপা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—সে কি ?

রিপন চৌধুরী বললে—হেড কোয়ার্টার থেকে আমার কাছে কাল বিকেলে চিঠি এসেছে, জাপানীদের বোমায় মারা গেছে সে।

আমি যেন সত্যিই এবার চমকে উঠলাম। কথাগুলো বলতেও রিপন চৌধুরীর মুখে কোনো ভাববৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেল না কিন্তু। রক্তমাংসের মানুষ কি করে এমন নির্বিকার হতে পারে—! এত ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে যায়—অথচ বাইরে মুখের রেখায় চোখের দৃষ্টিতে তার এতটুকু আভাস ধরা পড়ে না। মনে হলো—কাল বিকেলবেলা যখন ছেলের মৃত্যুসংবাদ এসেছিল তখন সেই মুহূর্তেও বোধহয় এমনি নির্বিকার হয়ে থাকতে পেরেছিল ওই মুখখানা।

ভারি ঘৃণা হলো রিপন চৌধুরীর ওপর। রিপন চৌধুরী সব পারে। যদি পরে কোনওদিন শুনি জেলে গিয়ে জেল-ওয়ার্ডারকে খুন করে ফেলেছে তাহলেও আমি আবাক হবো না।

এতদিন পরে এত বছর পরে সেই রিপন চৌধুরীর নাম মনে থাকার কথা নয়। সে রিপন চৌধুরীর কলকাতা থেকে পাঁচশো মাইল দূরে এই বিলাসপুরেই বা আসবে কি করতে বোঝা গেল না।

কোর্ট থেকে চৌহান সাহেবের ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

এসেই বললেন—চলো চলো, দেরি হয়ে গেল আমার—আমি আবার ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান—

গাড়ি বেরুল। দু'জনেই উঠলাম। আর কেউ নেই সঙ্গে।

চৌহান সাহেব বললেন—ওই তো চব্বিশ বছর বয়েসের ছেলে। কি ভাগ্য দেখ, তিন লাখ টাকার মালিক হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম—তা মারা যাবার ছ'মাস পরে উইল পড়া হবে কেন ?

চৌহান সাহেব বললেন—যেমন তার খেয়াল—এত বছর একসঙ্গে মিশেছি রিপন. চৌধুরীর সঙ্গে, কিন্তু তার খেয়ালের কোনদিন মানে বুঝতে পারিনি—জীবন নিয়ে অমন জুয়া খেলতেও দেখিনি কাউকে।

চৌহান সাহেবের কাছেই অনেক গল্প শুনলাম।

প্রথম যখন এখানে আসে রিপন চৌধরী তখন নাকি কপর্দকহীন অবস্থা। হাতে পয়সা নেই—কিন্তু ভাড়া ক'রে বসলো এক বিরাট বাড়ি! একলা মানুষ, অত-বড় বাড়ির কোনো প্রয়োজন ছিল না।

চাকর ঝি ঠাকুর রাখলো। তারপর কোথা থেকে কি হলো জানতে পারা যায়নি। কিছুদিন পরে দেখা গেল রিপন চৌধুরী মেলামেশা করছে বড় বড় লোকদের সঙ্গে। রায়গড়ের ঠাকুর সাহেব, পেণ্ড্রারোডের নর্মদাপ্রসাদ,—বিলাসপুরের ডি-সি, ফুড অফিসার আনসারী সাহেব। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব। একসঙ্গে তাস খেলে। একসঙ্গে শিকারে যায় শোন-নদীর ধারে অম[illegible]কণ্টকের জঙ্গলে।

তখন থেকেই দু-একটা মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেই রিপন চৌধুরী চৌহান সাহেবের কাছে আসতো।

ছোট ছোট মামলা। বাড়ির ভাড়ার জন্যে বাড়িওয়ালা হয়ত মামলা করেছে।

রিপন চৌধুরী বলতো—ও তিনশো টাকা আমি এখন দিয়ে দিতে পারি—কিন্তু দেবো না—

চৌহান সাহেব যদি জিজ্ঞেস করতেন—দেবে না কেন ?

একসঙ্গে পাঁচশো টাকা না জমলে দেব না—এই আমার নিয়ম।

পরের দিন হয়ত দেখা গেল, তিনশো টাকার জন্যে যার গলায় মামলা ঝুলছে, সে পাঁচশো টাকা খরচ করে পার্টি দিচ্ছে বন্ধুদের।

বাইজী আসছে নাগপুর থেকে। কপি, কড়াইশুটী, পেঁয়াজ আসছে কাটনি থেকে, চাল আসছে পেণ্ড্রারোড থেকে, চিনি আসছে নাগপুর থেকে। আর মদ আসছে রেলের রিফ্রেশমেণ্ট রুম্ থেকে।

তারপর একদিন কোথা থেকে টাকা পেলে কে জানে। বালাঘাট-এ ফরেষ্ট কিনে বসলো রিপন চৌধুরী।

রিপন চৌধুরী বললে—জিনিস কিনতে গেলে কি সব সময় টাকা লাগে ভাই!

জঙ্গল বেচা-কেনার দলিল এলো চৌহান সাহেবের কাছে। অদ্ভুত কাণ্ড! টাকা শোধ হবে কিস্তিতে। পুরো টাকা শোধ হতে লাগবে চার বছর।

চৌহান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কি করে কি হলো?

ফরেষ্টই কি একটা! বালাঘাটের পর সিউনি। সিউনি থেকে ছিন্দোয়াড়া। ছিন্দোয়াড়া থেকে পেণ্ড্রা।

জিজ্ঞেস করলাম—ওঙ্কার কবে হলো? ওর ছেলে ওই ওঙ্কার চৌধুরী?

চৌহান সাহেব বললেন—ও তো আসলে ওর ছেলে নয়—ওর পালিত ছেলে—ছত্রিশগড়িয়ার এক ছেলেকে মানুষ করেছিল রিপন চৌধুরী, সে ওর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতো—ওর জন্মের পরেই সে মারা গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম—ওকে কেন মানুষ করতে গেল?

কিন্তু উত্তর দেবার আগেই গাড়ি এসে পৌছে গেছে গন্তব্য-স্থানে। ওঙ্কার চৌধুরী নিজে দৌড়ে এসে ভকীল সাহাবকে অভ্যর্থনা করলে। আমাকেও নমস্কার করলে।

সামনের বারান্দায় আসর হয়েছে। নাচছে দু'জন বাইজী। ফুলের মালা, গোলাপ জল, আতর-দান। মহা ধুমধাম। রিপন চৌধুরীর একটা বিরাট অয়েল-পেন্টিং। বিলাসপুরের হোমরা-

তোমরারা সবাই এসেছে। চৌহান সাহেব আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের। সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম।

এর পরেই সিন্দুকের চাবি খোলা হবে। সিন্দুকের একটা চাবি আছে কমিশনারের কাছে আর একটা চাবি কোর্টের জিম্মায়। জোড়া চাবির ব্যবস্থা। জুয়াড়ী হলেও পাকা লোক রিপন চৌধুরী। মৃত্যুর আগে সমস্ত পাকা বন্দোবস্ত করে গেছে।

রাত তখন গভীর হয়ে এসেছে। বাইজীর গলা নিস্তেজ হয়ে এল। একদৃষ্টে চেয়ে দেখছি রিপন চৌধুরীর ছবিটার দিকে। সেই নির্বিকার দৃষ্টি। অবিচলিত মুখ। জুয়াড়ীর মুখে কোনও রেখার পরিবর্তন হতে নেই যেন।

হঠাৎ চৌহান সাহেব শশব্যস্তে বেরিয়ে এসে বললেন—চলো, চলো, চলে এসো—সর্বনাশ হয়ে গেছে—

কিসের সর্বনাশ!

গাড়িতে এসে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে।

বললাম—ব্যাপার কি?

চৌহান সাহেব বললেন—সর্বনাশ হয়ে গেছে, ওস্কার বেচারীকে রিপন চৌধুরী কিচ্ছু দিয়ে যায়নি।

—সে কী?

—তিনলক্ষ টাকা আর অতগুলো ফরেষ্ট—সব দিয়ে গেছে বেসিনের এক বিধবা বর্মী মেয়েকে, তার একটা নাবালক ছেলেও আছে—

—সে কি? কে সে?

—কে জানে। তা লেখাও নেই, আর তার নামও শুনিনি কখনও। রিপন চৌধুরী প্রেম নিয়েও যে আবার জুয়া খেলেছে তা জানতাম না। ভারি মুষড়ে পড়েছে ওস্কার বেচারী, কিচ্ছু দিয়ে যায়নি ওকে—

আমিও ভাবছিলাম, বর্মী মেয়ের সঙ্গে রিপন চৌধুরীর কি করে কবে কোথায় যোগাযোগ হলো কে জানে। রিপন চৌধুরীর চরিত্রের ওদিকের সংবাদটা তো জানা ছিল না। কাউকেই কিন্তু বলেনি সে। অবশ্য আশ্চর্য হবারও কিছু নেই। যে লোক সারা পৃথিবী এককালে ঘুরে বেড়িয়েছে, তার কাছে এ ঘটনা এমন কিছু অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

যাহোক পরদিন ভোরবেলা সূর্য ওঠবার আগেই বিলাসপুর ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে আমার জুনিয়র বসন্ত সব সন্দেহের নিরসন করে দিলে।

একদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকে বসন্ত বললে—রিপন চৌধুরীকে আপনার মনে পড়ে স্যার?

বললাম কেন?

—সেই রিপন চৌধুরী শুনলাম নাকি মারা গেছে। অনেক টাকা উইল করে রেখে গেছে এক বর্মী-মেয়ের নামে, শুনেছেন আপনি?

জিজ্ঞেস করলাম—মেয়েটা কে?

বসন্ত বললে—আজ্ঞে, আজ কোর্টে সেই কথাই হচ্ছিল, মেয়েটা বুঝি বিধবা, একটা নাবালক ছেলেও নাকি আছে, সাবালক হলে সে-ই পাবে, সে হলো রিপন চৌধুরীর নাতি—

অবাক হয়ে গেলাম!...আর মেয়েটা?

—মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল রিপন চৌধুরীর ছেলে, যখন সে সিঙ্গাপুরে ছিল।

বললাম—বর্মী-মেয়েটা তাহ'লে রিপন চৌধুরীর পুত্রবধূ?

বসন্ত বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলের বিধবা বউ।

জীবনে এই প্রথমবার যেন রিপন চৌধুরীর ওপর কেমন শ্রদ্ধা হতে লাগলো আমার।

গল্প কখনও শুনে, কখনও দেখে, কখনও ভেবে, কখনও বা রাস্তায় চলতে চলতে পাওয়া যায়। যদি তাতেও না হয় তো লোকের খোশামোদ করতে হয়। ও-হেন্‌রিকে গিয়ে মাতালদের সঙ্গে মিশে মদ খেতে হয়েছে গল্পের জন্যে। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে মাতালদের মদ খাইয়েছেন তিনি একটা গল্পের আশায়। ডিকেন্স রাত্তির বেলা রাস্তায় রাস্তায় ফুটপাথে-শোওয়া মানুষদের দেখতে বেরোতেন। যদি তাদের মধ্যে কোনও গল্প পেয়ে যান।

কিন্তু এ-ছাড়াও আর একটা পদ্ধতি আছে।

কিছু লোক আছে যারা পয়সার পরিবর্তে গল্প দিয়ে যায়। গল্প শোনানো যাদের ব্যবসা। আমার হরিপদ এই রকম একজন লোক। হরিপদর অভাবও চিরস্থায়ী, তার গল্পের ভাঁড়ারও অফুরন্ত। গল্পের ভাঁড়ার শূন্য হলে তখন হরিপদকে ডেকে প[illegible]াই। সে টাকার লোভে আবোল তাবোল অনেক গল্প বলে যায়। কখনও তা কাজে লাগে কখনও লাগে না।

একবার 'দেশ' পত্রিকা থেকে একটা হাসির গল্প লেখার তাগাদা এসেছিল। সে গল্প নিয়ে কী-রকম মুসকিলে পড়েছিলাম তা আমার আজো মনে আছে। হাসির গল্পর ভার হরিপদকে দিয়ে কী কাণ্ড হয়েছিল তা এই নিচের ঘটনাটা পড়লেই জানা যাবে।

হাসির গল্প লেখা বড় শক্ত। অবশ্য কান্নার গল্প লেখাও শক্ত, হাসির গল্প লেখাও শক্ত। আসলে গল্প লেখাই আমার কাছে শক্ত। গল্প-লেখক হিসেবে যখন একবার খ্যাতি হয়ে যায় তখন গল্প লেখা আরো শক্ত হয়ে যায়। দশজনে এসে তাগাদা করে। ভাববার সময় দেয় না। লেখবারও সময় দেয় না।

শেষ পর্যন্ত আমার গল্প-সাপ্লায়ার হরিপদকে ডাকতে হলো।

হরিপদ এল। আমার ফরমাশ শুনে অনেকক্ষণ ভাবলে। বরাবর বিপদের দিনে আমাকে হরিপদই উদ্ধার করেছে। হরিপদই বলতে গেলে আমার ভাগ্য-নিয়ন্তা। তার কাছে ফরমাশ দিলেই রেডি-মেড্ গল্প পেয়েছি। কিন্তু হাসির গল্পের কথা শুনে কেমন যেন ভাবনায় পড়লো হরিপদ। এর আগে হরিপদকে গল্প নিয়ে কখনও এমন ভাবনায় পড়তে দেখিনি।

হরিপদ বললে—আপনি বড় ভাবনায় ফেললেন মশাই—

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে—আচ্ছা দাঁড়ান মশাই, আমাকে একটা রাত টাইম দিন, আমার বউ-এর সঙ্গে একবার পরামর্শ করি, তারপর কাল আপনাকে বলে যাবো—

তারপর চলে যাবার সময় ফিরে দাঁড়াল। বললে—তা, হাসির গল্পের জন্যে কত দেবেন ?

বললাম—ওই যা তোমার রেট, পাঁচ টাকা—

হরিপদ বললে—কান্নার গল্পের জন্যে পাঁচ টাকা, আর হাসির গল্পের জন্যেও পাঁচ টাকা ? তা হয় না—

বললাম—না হয় না হবে, ওর বেশি আমি দিতে পারবো না—

হরিপদ বললে—এ আপনার বড় অন্যায় জুলুম মশাই, হাসি-কান্নার এক দর ? আমার মগজে হাসি নেই. আমি কোত্থেকে হাসির্ গল্প সাপ্লাই করবো আপনাকে ? হাসি কোথায় আছে বলুন সংসারে ? হাসি তো আর কান্নার মত পথে-ঘাটে ছড়ানো থাকে না। আপনি যে সেই মুড়ি-মিছরির এক দর করে ফেললেন মশাই—

বললাম—তা, তোমার পাঁচ টাকায় না পোষায় তো দরকার নেই, আজকাল অনেক গল্প-সাপ্লায়ার আসছে, তারা তিন টাকায় এখ্খুনি গল্প-সাপ্লাই করতে রাজী। বাড়িতে এসে দু'বেলা খোশামোদ করে যাচ্ছে—

হরিপদ ক্ষুণ্ণ হলো। বললে—এই তো আপনাদের দোষ! এখন আপনার নাম হয়েছে কিনা, এখন তো বলবেনই। অথচ এই হরিপদ ছিল বলে তবু নাম-ধাম করেছেন। নইলে সে-সব দিনের কথা ভাবুন তো একবার, যখন এক-টাকায় এই শর্মা আপনাকে গল্প সাপ্লাই করেছে, আর আপনি পত্রিকার অফিসে-অফিসে ধর্ণা দিয়ে বেড়িয়েছেন আর জুতোর সুখতলা ক্ষইয়ে ফেলেছেন। এরই নাম দুনিয়া মশাই, আমার দুনিয়া চেনা হয়ে গেছে—

হরিপদর এ-সব কথা নতুন নয়। এ-ধরনের কথা প্রত্যেকবার বলবে, রেট্ বাড়াবার জন্যে দর-কষাকষি করবে, আর শেষ পর্যন্ত গল্প ঠিকই সাপ্লাই করবে। এ হরিপদর পুরোন কায়দা। আমি ওতে বিচলিত হই না।

হরিপদ তখনও যায়নি। বললে—তা হলে কী করবো? যাবো, না···

বললাম—সে যা তোমার মর্জি—

হরিপদ আবার ফিরে এল। বললে—আপনি যে সেই হরিবিলাসবাবুর মতন করলেন!

বললাম—হরিবিলাসবাবুর কথা ছেড়ে দাও, আমি তো আর হরিবিলাসবাবু নই··

—একদিন তো হরিবিলাসবাবুর মত হবে, সব কিছু হবে। তখন আপনিও হরিবিলাসবাবুর মত আমাকে আর চিনতেই পারবেন না। অথচ ওই হরিবিলাসবাবুকে কে চিনতো শুনি? এই শর্মা না-থাকলে ওই সব মোটা-মোটা কেতাব ভেবে লেখবার সময় ছিল ওঁর? না, বিদ্যে ছিল?

বললাম—অন্য লেখক সম্বন্ধে আমার ঘরে বসে আলোচনা করতে হবে না, আমি ও-সব পছন্দ করি না, তুমি যাও—

হরিপদর আরো হয়তো কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু

আমার দিক থেকে কিছু গরজের প্রমাণ না-পাওয়ায় রেগে-মেগে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, পর দিন ভোর বেলাই আবার হরিপদ এসে হাজির। অন্য রকম চেহারা। হাসি-হাসি মুখ।

হরিপদ চেয়ারে বসে বললে—পেয়ে গেছি মশাই—

বললাম—কিন্তু পাঁচ টাকার বেশি দেব না, তা বলে রাখছি—

—তা আর কী করবো। পাঁচ টাকা পাঁচ টাকাই সই। ক'দিন র‍্যাশন আনা হচ্ছে না টাকার অভাবে। এই টাকাটা পেলে সোজা র‍্যাশনের দোকানে গিয়ে আগে চালটা নিয়ে আসবো, বউকে বলে এসেছি--

বললাম—বলো তাহলে, আমি শুনছি—। কোথায় পেলে গল্পটা?

—আজ্ঞে, আমার নিজের জীবনের গল্পটাই আপনাকে দিয়ে দিলুম—

—তা [illegible]মানে? তোমার জীবনে হাসির গল্প আছে নাকি?

হরিপদ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার একেবারে মনে ছিল না। বউকে গিয়ে কাল রাত্তিরেই বললুম। বললুম যে, একটা হাসির গল্প চাই, বড় ভাবনায় পড়েছি। বউ বললে—কেন, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা বলে দাও না, ওটাও তো হাসির। তা, আমিও ভেবে দেখলুম। সত্যিই তো, সেটাও তো এক হাসির ব্যাপার, শুনলে হাসতে হাসতে পেট একেবারে ফেটে যাবে।

আমিও একটু অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—সেকি! তোমার জীবনে যে আবার এত হাসি আছে তা তো জানতাম না, তুমি তো চিরকাল কাঁসি বাজাও আর ভ্যারেণ্ডা ভেজে বেড়াও বলেই জানতুম—

হরিপদ হাসতে লাগলো।

—না স্যার, মানুষকে বাইরে থেকে যা দ্যাখেন তা সে নয়, আসলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও আবার আর একটা মানুষ লুকিয়ে থাকে।

ও বাবা, হরিপদ যে আবার দার্শনিকের মত কথা বলে।

বললাম—ও কথা থাক, এখন তোমার গল্পটা বলো—

হরিপদ বললে—ঠিক আছে, তাহলে আপনার একটা ওই সিগ্রেট দিন—

দিলাম সিগারেট। হরিপদ নিজের পকেট থেকে দেশলাই বার করলে। ধরালে সিগারেটটা। তারপব ধোঁয়া ছাড়লো। আর তারপর মুখ উঁচু করে ভাবতে লাগলো।

বললাম—তুমি কি গল্প বানাচ্ছো নাকি?

হরিপদ বললে—না স্যার, আপনি বলছেন কি, আপনাকে আমি ঠকাবো? আমার ধম্ম বলে একটা কিছু নেই? আমি নেমক-হারাম বলতে চান? কী যে বলেন আপনি! আ[illegible]ক আপনি কি সেই রকম পেয়েছেন নাকি? আমি পাঁচটা [illegible]কার জন্যে আপনার কাছে ধম্ম বলি দেব?

. সে এক এলাহি কাণ্ড করে বসলো হরিপদ। যেন মিথ্যে বানানো গল্প বললে হরিপদর পরকালে নরক-বাস হবে, এই রকম ভাব করতে লাগলো।

বললাম—যা হোক, এবার বলো তোমার গল্প—

—তবে শুনুন—

বলে হরিপদ নাক-চোখ-মুখ কুঁচকে আরম্ভ করলে—তবে শুনুন, আমি স্যার চিরকালের বাউণ্ডুলে মানুষ। আপনি হয়তো ভাবছেন এখনই আমার এই দুর্দশা, আসলে তা নয়। চিরটা কাল আমার দুর্দশায় কেটেছে, আমি জন্ম-হাবাতে। মানে, কোনও কালেই আমার রোজগার ছিল না। সেই ছোটবেলাতেও যেমন, এখনও

তেমনি। খাই-দাই-কাঁসি-বাজাই গোছের। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই স্যার। অথচ দেখুন, আমিই আবার অন্য রকম হয়ে যেতে পারতুম। আমি আপনার চেয়েও বড়লোক হয়ে যেতে পারতুম। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি। কিন্তু আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, আমিই আজকে দশ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে বসতে পারতুম।

আমি হরিপদর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—দশ লক্ষ টাকা। বলছো কী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দশ লক্ষ টাকায় এক-এর পর ক'টা শূন্য দিতে হয় তা আমি জানি না বটে, কিন্তু সেই দশ লক্ষ টাকারই মালিক হয়ে গিয়েছিলাম আমি একদিন—

—কী রকম? সে-টাকাটা সব খুইয়েছ?

—আজ্ঞে, সেই গল্পটাই তো বলছি। দশ লক্ষ টাকা কি চালাকি কথা, বলুন। দশ লক্ষ টাকা ক'টা লোকের আছে বলুন তো? আমার বাবারও ছিল না, আমার ঠাকুর্দাদার ছিল না, আমার ঠাকুর্দার বাবারও ছিল না। আমার চোদ্দ-পুরুষেও কারো দশ লক্ষ টাকা ছিল না। দশ লক্ষ টাকা দূরের কথা মশাই, এক লক্ষ টাকাও দূরের কথা, এক হাজার টাকাই ছিল না কারো। আমরা মশাই বনেদী গরীব লোক, আমরা মশাই জীবনে কখনও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাইনি। খেতে পাইনি বটে, কিন্তু তার জন্যে কখনও মানুষ খুন করিনি, ডাকাতি করিনি, চুরি-চামারি করিনি। আমরা তাই কপালের মার হজম করে দু'বেলা আয়েস করে তাস পিটেছি, বিড়ি টেনেছি আর পেট ভরে আড্ডা দিয়েছি। ভেবেছি পয়সা যখন আমাদের কপালে নেই, তখন ও নিয়ে ভেবে ভেবে আর ব্লাড্-প্রেশার করি কেন? তার চেয়ে টাকার কথা না-ভাবাই ভাল। সেই ভেবে সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরোতুম আর বেলা তিনটের সময়

একবার বাড়ি ফিরে নাকে-মুখে ভাত গুঁজে আবার বেরোতাম আড্ডা দিতে। সারা দিন কেমন করে কাটতো সে আর বুঝতে পারতুম না। গ্রামের মানুষ আমরা। আমাদের ভৈরবগঞ্জ অজ পাড়াগাঁ হলে কী হবে, একটা সিনেমা-হাউস ছিল। সেই সিনেমা-হাউসের সামনে গিয়ে লাইন দিতুম। ব্যাপারীরা যারা গঞ্জে আসতো কেনা-বেচা-সওদা করতে, তারা দেখতো সেই ছবি। আমরা আগে থেকে লাইন দিয়ে সেই সব টিকিট কিনে রাখতুম, তারা এসে দেখতো হাউস-ফুল। তখন আমাদের কাছে বেশি পয়সা দিয়ে টিকিট কিনতো। আমরা চার আনার টিকিট ছ' আনায়, ছ' আনার টিকিট ন' আনায় বেচতুম। সেই বাড়তি পয়সা দিয়ে আমরা চা-সিগারেট-বিড়ি খেতুম, ফূর্তি করতুম। ভৈরবগঞ্জে একটা হোটেল ছিল। তার নাম 'শ্রীশ্রীকালীমাতা হিন্দু হোটেল'। সেই হোটেলের সামনে ছিল হোটেলের চায়ের দোকান। মানে, খুচরো খদ্দেররা সেখানে বসে বিশ্রাম করতো, চা খেতো। আর য[illegible] একদিন-ছুদিনের জন্যে ভৈরবগঞ্জে কারবার করতে আসতো, [illegible]দের জন্যে ভেতরে থাকবার বন্দোবস্ত ছিল। কুয়ো ছিল, পায়খানা ছিল, নাইবার জন্যে ঘেরা ঘর ছিল। মোট কথা, পাড়াগাঁয়ে যা কিছু আরাম পাওয়া সম্ভব, সবই ছিল 'শ্রীশ্রীকালীমাতা হিন্দু হোটেলে'। রেট কিন্তু বেশি নয়। দিনে মাথা পিছু পাঁচ সিকে দিলেই থাকা-খাওয়া···

আমি বাধা দিলাম। বললাম—হোটেলের খবর শুনে আমার কী লাভ হরিপদ, সেই দশ লক্ষ টাকার কী হলো, তাই বলো?

হরিপদ বললে—এই-ই তো আপনাদের দোষ স্যার, আপনি নিজে স্টোরি-রাইটার হয়ে এত অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, তাহলে আপনার পাঠকদের কী অবস্থা হবে বলুন তো—

—তুমি একটু ছোট করে বলো না, আমি ঠিক গুছিয়ে লিখে দেব'খন—

—তাই কখনও হয় স্যার? আপনার সঙ্গে আমার তফাৎটা কোথায় বলুন তো? আপনিও গল্প লেখেন, আমিও গল্প লিখি, আপনি লেখেন কাগজে-কলমে আর আমি লিখি মনে-মনে মুখে-মুখে। মাঝখান থেকে ক্ষীরটা আপনারাই মারেন, আর আমরা উপোস করে মরি—

বললাম—বাজে কথা রাখো তোমার, গল্পটা বলো—

—তাহলে শুনুন, একদিন ভৈরবগঞ্জের 'শ্রীশ্রীকালীমাতা হোটেলে' একলা বসে আছি। তখন টা টা করছে রোদ। তারই মধ্যে দু'কাপ চা খেয়ে ফেলেছি। আর ট্যাঁকে পয়সা নেই যে খাবো, তাই বসে বসে ভাবছিলুম কোথায় যাই এই রোদের মধ্যে। অথচ বাড়ি যেতেও ইচ্ছে করছে না। আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। থাকবে [illegible]? কেউ তো আমার মত আর বাউণ্ডুলে নয়। সকলের বউ আছে, সংসার আছে। সবাই যে যার বাড়িতে আরাম করে ঘুমোচ্ছে। আমার বাড়িও নেই, ঘরও নেই, সংসারও নেই, বউ-ছেলে-মেয়ে কিছুই নেই। থাকবার মধ্যে আছে কেবল আমার এক বিধবা বুড়ি দিদিমা।

তা, সেই দিন সেই দুপুর বেলা সেই 'শ্রীশ্রীকালীমাতা হোটেলে'ই কাণ্ডটা ঘটলো।

—কী কাণ্ড?

—সেই দশ লক্ষ টাকার কাণ্ড।

—তার মানে, তুমি দশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে পেলে নাকি?

হরিপদ বললে—না স্যার, কুড়িয়ে পেলাম না। তা, কুড়িয়ে পেলামও বলতে পারেন বৈ কি!

—তা, দশ লক্ষ টাকা পেয়ে তুমি উড়িয়ে দিলে?

হরিপদ হো-হো করে হাসতে লাগলো।

বললে—না স্যার, দশ লক্ষ টাকা পেয়ে পাগলও হয়ে যাই নি, উড়িয়েও দিই নি। সে এক মজার ব্যাপার হলো, সেইটেই তো বলছি আপনাকে—

হরিপদর গল্প বলা এই রকমই। হরিপদ আমাকে অনেক গল্প দিয়েছে বটে, কিন্তু তাকে ঘসে মেজে দাঁড় করাতে আমার অনেক পরিশ্রম হয়। অনেক ফালতু কথা বলে, অনেক ঘোরায়, অনেক ডাল-পালা জুড়ে দেয়, যা গল্পের পক্ষে অনাবশ্যক। গল্পের একটা নিজস্ব গতি আছে, একটা নিজস্ব পরিণতিও আছে। একটু এদিক-ওদিক হলে আঘাটায় গল্পের ভরা ডুবি হয়। সেই জন্যেই সব লেখকের সব গল্প শেষ পর্যন্ত পড়া যায় না। পড়তে ভালো না। তার কারণও ওই। যে গল্পের শেষ নেই, সে-গল্প গল্পই নয়। আর সেই অবধারিত শেষের দিকে যে গল্প একাগ্র হয়ে এগোয় না, সে-গল্প পাঠকেরও মন জয় করতে পারে না। তাই [illegible]। পড়তে পড়তে পাঠক ঘুমিয়ে পড়ে, পাঠক হাই তোলে, পাঠক [illegible] বন্ধ করে রেখে গল্প করতে শুরু করে। তা' হরিপদকে আমার জানা ছিল বলেই আমি মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে তাকে আসল গল্পের বাঁধা পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু হরিপদকে যদি আমি সায়েস্তাই করতে পারবো তো আমি সাহিত্যিক না হয়ে হরিপদই সাহিত্যিক হয়ে যেত, আর আমি তাকে গল্প সরবরাহ করতাম।

হরিপদ ততক্ষণে আর একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলেছে। লম্বা টান দিয়ে হরিপদ বললে—তাহলে এবার ব্যাপারটা কী হলো বলি—

বললাম—বেশি ডালপালা দিও না, আসল গল্পটা বলো। ডালপালা যদি লাগাতে হয় তো আমি তা জুড়ে দেব, তোমায় সে-সব ভাবতে হবে না—

হরিপদ—বললে—আমাকে আর আপনাকে গল্প-লেখা শেখাতে হবে না স্যার, নেহাৎ বানান ঠিক হয় না তাই নিজে লিখি না, নইলে কি আর স্যার আপনাদের কাছে এসে ধর্ণা দিই? ভাবছেন আপনারা গল্প লিখে কত টাকা পান আমি জানি না? আজকাল এক-একজন লেখক বাড়ি-গাড়ি সব করছেন, আমি কিছু দেখছি না মনে করেছেন? আমাকে আপনি তো দেবেন মাত্তোর পাঁচ টাকা, অথচ চালের মণ চল্লিশ টাকা হয়ে গেচে, সে-খবর রাখেন?

তারপর একটু থেমে বললে—সেবার যে-গল্পটা আপনার সিনেমায় হলো, ওটা কার বলুন? বুকে হাত দিয়ে বলুন, কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন গল্পটা? আপনি তো হাজার দশেক টাকা মেরে দিয়ে বেশ কাশ্মীর ঘুরে এলেন, আর আমি পুজোর সময় বউকে একটা নতুন শাড়ি পর্যন্ত কিনে দিতে পারিনি, তা জানেন?

এবার আমাকে শক্ত হতে হলো। বললাম—দরকার নেই তোমার গল্প বলে, আমি অন্য লোক দেখবো, এমন অনেক লোক আছে যারা বিনা পয়সায় আমাকে গল্প বলে যাবে, তা জানো? আমার কাছে অনেক লোক আসে তাদের জীবনী নিয়ে উপন্যাস লেখাবার জন্যে, এবার থেকে তাদের কাছ থেকেই গল্প নেব, আমারও পাঁচটা করে টাকা বেঁচে যাবে—

হরিপদ এই কথায় জব্দ হলো। বললে—আমি কি তাই বলছি নাকি স্যার? আমি কি বলছি আপনাকে গল্প দেব না? আমি আপনাকে কত গল্প দিয়েছি বলুন তো? সব আপনি ভুলে গেলেন? আজকে চালের দাম চল্লিশ টাকা হয়েছে বলেই তো একটু মাথাটা গরম হয়ে গেছে। নইলে আমার মত ঠাণ্ডা লোক আপনি দেখেছেন?

বললাম—তাহলে বলো তোমার গল্পটা—

হরিপদ বললে—আপনি যে বড় বাধা দেন স্যার, গল্প বলতে বলতে বাধা দিলে রস কেটে যায় না ?

বললাম—ঠিক আছে, আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, তুমি সেই ভৈরবগঞ্জের শ্রীশ্রীকালীমাতা হিন্দু হোটেলের মধ্যে দুপুরবেলা দশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে পেয়ে গেলে—

—না স্যার, কুড়িয়ে পেলুম বল্লে মিথ্যে বলা হয়। আমি আপনাকে খুলেই বলছি সবটা—

হরিপদর ভয় হয়েছিল হয়তো টাকাটা পাবে না আর। সত্যিই বড় অভাবগ্রস্ত লোক হরিপদ। কখনও ফরসা জামা-কাপড় পরতে দেখিনি হরিপদকে। বেশ পেটভরে বিড়ি খেতেও পারেনি কখনও। ভাত তো দূরের কথা। নিজের অভাব অভিযোগ নিয়েই বরাবর তাকে বিব্রত থাকতে দেখেছি। পাঁচটা করে টাকা চে[illegible] পায় আমার কাছ থেকে, কিন্তু সেই পাঁচটা টাকাই যখন [illegible]পতে নেয়, তখন সে এক দেখবার মত চেহারা হয় তার। চো[illegible]টো বড় বড় হয়ে যায়, ঠোঁট-দুটো ফাঁক হয়ে আসে। যেন লাখ টাকা তার হাতে এসে গেছে—এমনি ভাবখানা।

আজ সেই হরিপদর মুখে তার দশ লাখ টাকা পাওয়ার ঘটনা শুনে সত্যি-সত্যিই হতবাক হয়ে গেলাম।

হরিপদ বলতে লাগলো—যাক গে, আসল গল্পটা এবার শুনুন —সেই ভৈরবগঞ্জের শ্রীশ্রীকালীমাতা হোটেলে একদিন এক ভদ্রলোক এসে উঠলেন। কোনও ভদ্রলোককে এমনিতে কালীমাতা হোটেলে উঠতে কখনও দেখিনি। যারা ধান-চালের ব্যাপারী তারাই মাথা গোঁজবার জন্যে ওখানে ওঠে, তারপর আবার সওদা নিয়ে চলে যায়।

আমি একটু তেরছা চোখে ভদ্রলোককে দেখলাম। অচেনা

মুখ। হাতে একটা ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে কাগজ-পত্র কী সব রয়েছে। একমনে তাই পড়ছিলেন।

আমাকে দেখে ভদ্রলোক মুখ তুললেন। কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন।

আমি ডাকা-বুকো মানুষ। আমার অত ভয়-ভীত্ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—কোত্থেকে আসা হচ্ছে আপনার?

ভদ্রলোক বললেন— আমি আসছি কলকাতা থেকে—

—তা, এখানে কোথায় এসেছেন?

ভদ্রলোক বললেন—এই ভৈরবগঞ্জে এসেছি—

বললাম—ভৈরবগঞ্জে, তা তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কাজটা কী?

ভদ্রলোক যেন একটু দ্বিধা করতে লাগলেন। বললেন— আপ[illegible] কি এই ভৈরবগঞ্জে থাকেন?

[illegible]—আমার জন্ম মশাই ভৈরবগঞ্জে—জন্ম কর্ম সবই এই ভৈরবগ[illegible] আপনি ভৈরবগঞ্জ সম্বন্ধে কী জানতে চান, বলুন না। আমি [illegible] বলে দেব—

ভদ্রলোক বললেন—আমি একজন লোককে খুঁজতে এসেছি,—

—কোন লোক বলুন? আমি খুঁজে বার করে দেব—

ভদ্রলোক বললেন—সে এখানে থাকে না, থাকে পাত্‌সরে—

—পাত্‌সর? পাত্‌সরও চিনি। পাত্‌সরে আমার মামার বাড়ি।

ভদ্রলোক যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন—পাত্‌সরে আপনার মামার বাড়ি? আপনি পাত্‌সরে গেছেন?

—বলেন কি মশাই, মামার বাড়ি যাবো না? ভাগ্নে হয়ে জন্মেছি আর মামার আদর পাবো না, এ কি হতে পারে? আপনি বলছেন কী?

আসলে মশাই, আমার মামারা এখন সবাই মারা গেছে। মামার বাড়ি বলতে এখন আর আমার কিছুই নেই সেখানে। মামারা মারা গেছে, মামীরা মারা গেছে। মামাতো ভাইরা আছে বটে, কিন্তু আমাকে এখন আর তারা মানুষ বলেই ভাবে না। আর আমার টাকা কড়ি কিছু নেই, রোজকারপাতি করি না, কেন দেখবে বলুন? আপন বাপ-মাই আজকাল টাকা না দিতে পারলে হতচ্ছেদ্দা করে তো মামাতো ভাই!

তা আমি সে-কথা ভাঙলুম না মশাই। ভাবলাম দেখি না ভদ্রলোকের কী মতলোব!

ভদ্রলোক বললেন—আমি পাতসরে গিয়েছিলুম—কিন্তু সেখানে থাকতে পারলুম না, আমার কোন কাজ হলো না—এত মশা, এত নোংরা—একটা হোটেল পর্যন্ত নেই যে থাকি—

পাতসর নোংরা জায়গাই বটে। এককালে গঞ্জ ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া মহামারী হয়ে দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। যাদের একটু টাকা-কড়ি ছিল তারা সব পাতসর ছেড়ে অন্য [illegible]র চলে গিয়েছে। বলবার মত লোক আর কেউ নেই সেখানে।

বললাম—আপনি কি আর সে-রকম জায়গায় থাকতে পারবেন মশাই, আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক আমরাই বলে সেখানে গিয়ে পালাই-পালাই করি—কেন মিছিমিছি সেখানে যেতে গেলেন?

—আমি কি সাধ করে গিয়েছি মশাই, চাকরির দায়ে যেতে হয়েছে—

জিজ্ঞেস করলাম—কী কাজ আপনার?

ভদ্রলোক বললেন—আমি মশাই অ্যাটর্নী-অফিসে কাজ করি, অ্যাটর্নী-অফিসের বাবু! আমাদের ফার্মের নাম হলো 'গাঙ্গুলী মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি'। অফিস থেকে এত চিঠি লেখা হচ্ছে তবু একটা উত্তর নেই, শেষ কালে আসতে হলো আমাকেই—। এক

ভদ্রলোক বর্মা থেকে উইল করে তাঁর নামে দশ লক্ষ টাকা দিয়ে গেছেন। সেই টাকাটা দিতে এসেছি। এসব দেশে আগে কখনই আসিনি আমি, একটা ভালা হোটেলও নেই যে থাকি। এই 'শ্রীশ্রীকালীমাতা হোটেলে' এসে এখন উঠেছি, এখান থেকেই যদি মহিলাটির ঠিকানা পাই, সেই চেষ্টাই করছি—

—মহিলাটির নাম কী বলুন?

ভদ্রলোক বললেন—আলোচনা দাসী—

—আলোচনা দাসী!

অদ্ভুত নাম। পাত্‌সর অবশ্য ছোট গ্রাম। বড় জোর তিনশো ঘর বামুন কায়েত! আর সব চাষা কামার কুমোর। তারা কেউ চাষ করে, কেউ বা মাছ ধরে। কেউ বা যজমানি বৃত্তি করে।

পাত্‌সরে গিয়ে যে কেউ বাইরের লোক থাকতে পারে এমন কল্পনা করা অসম্ভব। আমি নিজেই কোনওদিন সেখানে গিয়ে রাত কাটা[illegible]নি।

ভদ্র[illegible] বললেন—সেখানকার কাদা আর মশা দেখে আমি মশাই [illegible] বাপ্‌ বলে পালিয়ে এসেছি—

আমি বললাম—আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, আমি গিয়ে তাকে অপানার কাছে এনে হাজির করবো।

—আপনি চিনতে পারবেন?

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—চিনতে পারবো না বলছেন কেন? আমি তো তাদের চিনিই—

ভদ্রলোক যেন নিশ্চিন্ত হলেন আমার কথা শুনে। বললেন—তাহলে তো ভালোই হলো, আমাকে আর কষ্ট করে সেখানে যেতে হবে না—এখানে এলে তার হাতেই চিঠিটা দিয়ে দেব, আমার কাজ ফুরিয়ে যাবে—

ভদ্রলোককে কথা দিয়ে আমি তো পাতসরে ছুটলাম তখনি। আসলে আমি পাতসরের কাউকেই চিনতাম না। আমার মামারা ছিল, তারা সবাই মারা গেছে তখন। মামাতো ভাই-বোনেরাও আর কেউ সেখানে নেই তখন। ছোটবেলায় পাতসরে গিয়েছিলাম। তারপর পেটের ধান্দায় আর কখনও যাওয়া হয়নি ওদিকে। কিন্তু দশ লাখ টাকার ব্যাপার, এমন সুসংবাদটা যাকে গিয়ে দেব তার কাছ থেকে আমার ভাগ্যেও তো ছিটে-ফোঁটা কিছু মিলতে পারে!

দুর্গা বলে তো গেলাম পাতসরে।

প্রথমে গিয়ে কাউকেই কিছু ভাঙ্গলুম না। মামাদের বাড়িটা ভেঙ্গে পড়ে আছে। ভেতরে কিছুই নেই। একটা কাঁঠাল কাঠের বিরাট সিন্দুক খালি পড়ে আছে আর গোটা কতক কুলো-ডালা। বিদেশে যে-যার চাকরি করছে। এ বাড়ির মায়াও কারো নেই। কেউ ভাগ চাইতেও আসবে না কোনও দি[illegible]।

পাড়ার দু-একজন বৃদ্ধ মানুষ এল দেখা কর[illegible]কটা উপদেশ-টুপদেশ দিলে। কিছুটা খোঁজখবরও নি[illegible] দিদিমা কেমন আছে? অমুকের বিয়ে হয়েছিল কোন্নগরে, [illegible]রা কী করছে? ছেলে মেয়ে ক'টা? ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক খবর। আমি কিন্তু সে-সব খবরের জন্যে তখন বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার মাথায় তখন কেবল আলোচনা দাসী ঘুরছে।

নিজের হাতে ভাত ফুটিয়ে নিয়ে দুটো খেয়ে সারা দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আর সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে নিজের বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

এমনি করেই দু'টো দিন কেটে গেল। কোনও কিনারা পেলাম না। গাঁয়ের মানুষ দেখলেই আলাপ জুড়ে দিই। জিজ্ঞেস করি, কার কোথায় দেশ। কার কোথায় আত্মীয়-স্বজন থাকে। যেমন লোকে জিজ্ঞেস করে পরস্পরকে। কারো ঢাকায়

আদি বাড়ি। কারো রাজসাহীতে। তখন মশাই পাকিস্তান হয়নি। তখন দেশেও আকাল পড়েনি। তখনও মানুষ এখনকার মত হা-টাকা যো-টাকা করতো না। তখন তবু লোকে আত্মীয় স্বজনের খবরাখবর নিত। হরেনবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন —এবার একটা বিয়ে-থা করে ফেল বাবা—

বললাম—বিয়ের কথা-বার্তা তো চলছে, আর বিয়ে না করলে চলছেও না—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই, কতদিন আর হাত পুড়িয়ে খাবে—

হাত পুড়িয়ে খাওয়ার কথাটা আমিই পাত্‌সরে গিয়ে তুলে দিয়েছিলাম। তা ছাড়া, ভাল মাইনে পাই মাসে মাসে তাও সবাই জেনে গিয়েছিল পাত্‌সরে।

দু[illegible]দবাবু বললেন—কত পাও? তিনশো টাকা?

[illegible] টাকাতো শুধু মাইনে, উপরিতেও শ'তিনেক পাই—

[illegible]াকা পাও, অথচ এখনও বিয়ে করোনি? তুমি তো মানুষ খুন করবে হে!

সত্যিই সে এক অদ্ভুত দেশ পাত্‌সর। সমস্ত গ্রামটা যেন আমার মাইনের খবরে বেসামাল হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতির বেড়ে গেল। লোকের ভিড় জমে গেল বাড়িতে।

হরেনবাবু বললেন—তুমি আর বাবা ওই ভাঙ্গা বাড়িতে থেকো না, আমার বাড়িতে চলে এসো—

দুর্গাপদবাবু বললেন—তুমি বাবা তার চেয়ে আমার বাড়িতে এসো না, আমি থাকতে তুমি নিজের হাতে রান্না করে খাবে এটা তো ভালো দেখায় না—

রাতারাতি আমি একেবারে সকলের পরম আত্মীয় হয়ে গেলাম মশাই। সকলেই আমার কাকা, জ্যাঠা, মাসীমা, পিসীমা হয়ে

গেল। কার কোথায় দেশ, আত্মীয়-স্বজন কার কোথায় থাকে, তাও জেনে নিলাম।

শুধু রমেশবাবু, হরেনবাবু, পরেশবাবু নয় কত যে মাসীমা, কাকীমা, দিদিমা পাতিয়ে ফেললুম দুদিনের মধ্যে তার ঠিক নেই।

ন'মাসীমা বললে—তুমি বাছা আইবুড়ো হয়ে আর ক'দিন থাকবে?

—একটা ভাল দেখে পাত্রী দেখে দিন্ না আপনারা, আমি বিয়ে করছি।

—তা, পাত্রীর কি অভাব বাবা এখানে! আমার বড় জা'-এর মেজ মেয়েই তো রয়েছে, তাকে বিয়ে করো না তুমি!

এমন মুশকিলেই পড়লুম মশাই যে কী বলবো? আমি তো আমার আসল উদ্দেশ্য খুলে বলতে পারি না সকলকে। আমি ভৈরবগঞ্জে ভদ্রলোককে বলে এসেছি দু-একদিন আমার জন্যে অপেক্ষা করতে। কিন্তু আমার যদি দেরি [illegible]। [illegible]রতে, ভদ্রলোক কি আর আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?

আমি সেই দিনই একটা পোস্টকার্ড ফেলে দিলুম [illegible]ঞ্জের ঠিকানায়। লিখে দিলুম আমার অসুখের জন্যে আমি পাতসরে আটকে পড়েছি। আমি না-ফেরা পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করেন।

এদিকে তখন গাদা-গাদা মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি আমি। পাতসরে মেয়েরও গাদা মশাই। এত আইবুড়ো মেয়ে যে আছে পাতসরে তা জানতুম না। সকালে মেয়ে দেখি, দুপুরে মেয়ে দেখি, বিকেলে মেয়ে দেখি, আবার রাত্তিরেও মেয়ে দেখি। সব ডাগর-ডাগর মেয়ে। সকলকেই নাম জিজ্ঞেস করি। আমি পাত্র হিসেবে ভাল। তিনশো টাকা মাইনে পাই। কে আর না আমাকে মেয়ে দেখাবে?

কেউ নাম বলে—কমলা—

কেউ বলে—লক্ষ্মী—

সবই বাহারে নাম। ডাগর-ডাগর মেয়ে। মা কি মাসীমার বেনারসী শাড়ী পরে ভারি-ভারি সোনার গয়না গায়ে দিয়ে সেজে-গুজে সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি নাম জিজ্ঞেস করি। দেখতেও কেউ কেউ রূপসী। আসলে টাকার জন্যেই কারো বিয়ে হচ্ছে না। আমি তো টাকা নেব না। তাই মেয়েদের বাপ-মায়ের বড় আগ্রহ আমার সঙ্গে যার যার মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে।

কাউকেই আর পছন্দ হয় না।

হবে কী করে? কারো নাম তো আলোচনা দাসী নয়। আলোচনা দাসী হলেই আমার পছন্দ হয়ে যায়। আমি আর কিছু চাই না।

শেষকালে মশাই একজন পাত্রী নাম জিজ্ঞেস করতেই বললে—তার না[illegible] আলোলতা দাসী।

[illegible]ুম মশাই। আলোলতা আর আলোচনা কি এক?

ব[illegible] সামনে ছিল। তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম—আ[illegible] রকম নাম?

একে বুড়ো মানুষ, তায় চোখে দেখতে পায় না বুড়ো।

বললে—বাবাজী, আমরা তো ঠাকুর দেবতার নামই দিয়ে থাকি ছেলে-মেয়েদের, কিন্তু ও যখন জন্মালো তখন ওর মামা শহরে থাকে কি-না, সে-ই ও-নাম দিয়েছিল—

—সে মামা এখন কোথায়?

—সে বাবাজী বিয়ে-থা কিছু করে-টরেনি। আলোকে আমার বড় ভালবাসতো সে। পূজোর সময় আমার মেয়েকে শাড়ি কিনে দিত, গয়না দিত—তারপর চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে যে কোথায় চলে গেল, আর কোনও খোঁজ-খবর নেই, শুনেছিলাম ব্যবসা করছে, অনেক খোঁজ করেছি, কিছু খবর পাইনি। কেউ বলে মারা

গেছে, কেউ বলে কোটিপতি হয়ে বিলেতে গিয়ে মেমসাহেব বিয়ে করেছে, কেউ বলে বর্মা মুলুকে···

—বর্মা ?

আমি কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠেছি। বর্মা! আমার মাথায় বিদ্যুৎ চমকে উঠেছে। বর্মা বর্মায় চলে গিয়েছে মামা!

আমি জিজ্ঞেস করলাম—বর্মায় গেছে জানলেন কী করে ?

—আমরা আর কী করে জানবো। লোক-মুখে শুনেছি।

—কোন্ লোক ? কারা ?

—সে কি মনে আছে বাবাজী ? বহুকাল আগে কে কার কাছে শুনেছে, তারপর আমাদের বলে গেছে। সে সব আমাদের বিশ্বাস হয় নি। এতদিন যখন খোঁজ-খবর নেই, তখন আর কি সে বেঁচে আছে ?

তা, এ-সব কথা আমার আর শোনবার দরকার ছিল না তখন। মামাই হোক আব দাদামশাই-ই হোক, তা নিয়ে [illegible]। [illegible] কারণ নেই। আমি মশাই তখন ছট্‌ফট্ করছি। ওদি[illegible] [illegible]দ্রলোককে বসিয়ে রেখে এসেছি ভৈরবগঞ্জে। আর কতদিন অ[illegible]গা[illegible]া যায় তাকে।

—আমি তাহলে এখানেই বিয়ে করবো। আপনারা ব্যবস্থা করুন—

মেয়ের বাবা বললে—তাহলে বাবা দেনা-পাওনার কী হবে ?

বললাম—আমি একটা পয়সা নেব না—

সে কি বাবা ? আমার কি অত সৌভাগ্য হবে ?

বুড়ো ভদ্রলোক যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। চোখ দুটো তাঁর ছল্‌ছল্ করে উঠলো। হরেনবাবু, রমেশবাবু পাত্রসরের যারাই কথাটা শুনলে তারাই অবাক হয়ে গেল। এত ভাল পাত্র অথচ একটা পয়সাও নেবে না!

অবাক কাণ্ড!

—তাহলে কবে বিয়েটা হবে?

—আজই করুন, আজই ব্যবস্থা করে ফেলুন। আমার তো আবার অফিসের ছুটি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

তা বলে আজ কী করে হয়? আমার তো যোগাড়-যন্তর করতে হবে। দু-দশ জনকে খবর দিতে হবে।

—তাহলে কাল। তার পরে হলে আমি আর বিয়ে করবো না কিন্তু—

তা, এমন ভাল পাত্র হাত-ছাড়াই বা কী করে করা যায়। সুতরাং ভদ্রলোক তাতেই রাজী হয়ে গেলেন। অবস্থা ভদ্রলোকের শোচনীয়। বয়েসও অনেক। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। স্ত্রীও বহুদিন মারা গেছে। অর্থাৎ মেয়ের মা। এত তাড়াতাড়ি সব যোগাড় করা সম্ভব নাকি। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। পরদিন [illegible] পুঁথি দেখিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করা হয়ে গেল। আমিও [illegible] হাতেই বিয়ে করতে গেলাম মশাই।

[illegible]র ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল।

হরেনবাবু বললেন—কী বাবাজী, এত ভাল ভাল মেয়ে দেখালাম তোমাকে, শেষকালে কালীবাবুর মেয়েকে পছন্দ হলো?

রমেশবাবুরও ওই এক কথা।

মাসীমা, পিসীমা, দিদিমা যে যেখানে ছিল সকলেরই ওই এক কথা। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে তো পাত্রীকে দেখতে ভাল নয়। তার ওপর গায়ের রং কালো। তার ওপর একটা পয়সাও যৌতুক নিলাম না। এতে সব্বাই বললে—এমন হীরের টুকরো ছেলে মাটির দরে বিকিয়ে দিল।

আমি সেদিন মনে মনে হেসেছিলাম মশাই।

এরা তো জানে না মশাই আমার কী মতলোব! আমি তখন

লাখ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছি। আমি যখন এই পাত্সরে গাড়ি হাঁকিয়ে আসবো, তখন বুঝবে কেন আমি বিয়ে করলাম এমন মেয়েকে।

হরিপদ বলতে লাগলো—তারপর শুনুন, আমি তো বিয়ে করে আর একদিনও দেরি করলুম না—

ফুলশয্যাটা সেরে পরের দিন ভোরবেলাই বৌ নিয়ে এলাম ভৈরবগঞ্জে। বাড়ি নয়, একেবারে সোজা হাজির হলাম শ্রীশ্রীকালীমাতা হোটেলে।

ভদ্রলোক আমাকে দেখে হাতে স্বর্গ পেল।

বললেন—কী মশাই, এতদিন কোথায় ছিলেন?

আমি বললাম—এই তো মশাই আপনার আলোচনা দাসীকে নিয়ে এলাম সঙ্গে করে।

বললাম—এই নিন্, ইনিই আপনার আলোচনা দাসী—আমার স্ত্রী—?

ভদ্রলোক সামনে যেন তখন সাপ দেখেছেন

বললেন—আপনার স্ত্রী?

হ্যাঁ মশাই, নিজের বিয়ে করা স্ত্রী—এখন দিন একে আপনার টাকা—

ভদ্রলোক আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—আপনার নাম তো আলোচনা দাসী?

আমার স্ত্রী ভয়ে জড়-সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এ-সব ব্যাপার কিছুই বলিনি তাকে। বললাম—বলো, তোমার নাম বলো উকিলবাবুকে—

আমার স্ত্রী মশাই মুখ্যু মেয়েমানুষ। কেন নাম জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তাও বুঝতে পারলে না। মুখ নীচু করে বললে—আলো—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—আপনি যাকে খুঁজছেন এ সেই। এই আমার স্ত্রী—

ভদ্রলোক বললেন—আপনাদের অনেক চিঠি দেওয়া হয়েছিল, একটা উত্তর পর্যন্ত পাইনি—চিঠি কি পান নি?

—চিঠি পেলে কি আর কেউ উত্তর দেয় না মশাই? এ কি হয়?

ভদ্রলোক বললেন—আপনি বুঝি একেবারে বিয়ে করে নিয়ে এলেন ওকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ের কথা আগে থেকেই চলছিল, এখন এই সূত্রে পাকাপাকি হয়ে গেল, তাই বিয়েটা সেরেই একেবারে চলে এলাম—এখনও বউ নিয়ে বাড়ি যাইনি—

—ভালোই করেছেন—

ব[illegible] ভদ্রলোক কাগজপত্র বার করে সব লিখে নিয়ে নিলেন। বল[illegible]দার ভাগ্যটা ভাল মশাই, আপনার বুদ্ধিটাও পাকা—

[illegible]টাকাটা পাবো তো ঠিক—?

ভদ্রলোক বললেন—পাবেন না কেন? নিশ্চয়ই পাবেন! আমি আগে জানলে মশাই নিজেই এই বিয়েটা করে ফেলতুম—আমার মাথাতে বুদ্ধিটা আসেই নি—

—তা, কবে পাবো টাকাটা?

ভদ্রলোক বললেন—এই সই নিয়ে আগে আফিসে যাই, তখন আপনাকে জানাবো—

—কত দেরি হবে পেতে?

—দেরি কিসের? গভর্নমেন্টের অফিসে যা দেরি, নইলে দেরি আমরা নিজেরা করবো না, টাকাটা পেলেই আপনার স্ত্রীর নামে পাঠিয়ে দেব—
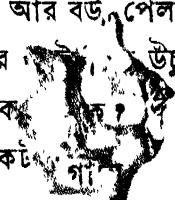
—মনি অর্ডার না চেক্ ?

—দশ লাখ টাকা মনি-অর্ডারে পাঠাবো কী করে মশাই! তাই কখনও কেউ পাঠায়, না পোস্ট-অফিসেই অ্যালাও করে? আপনার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট্ আছে?

বললাম—না—

—তাহলে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট্ খুলে ফেলুন—

তা, সেই ব্যবস্থাই হলো। ভৈরবগঞ্জে ব্যাঙ্ক নেই। ব্যাঙ্ক ছিল কালীনগরে। পরদিনই সেখানে গিয়ে পাঁচটা টাকা ধার করে একটা স্ত্রীর নামে অ্যাকাউন্ট খুললাম মশাই।

আমার নতুন টাটকা বউ। তখনও তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়নি। দিদিমা তো বউ দেখে অবাক। পাড়ার লোকজন সবাই ভিড় করে দেখতে এল। সবাই বউ দেখে কিন্তু মুখ বেঁকালো। শেষকালে বিয়ে করে নিয়ে এলাম এই বউকে! আর বউ, পেলাম না? বউ-এর কি আকাল হয়েছে? সামনের [illegible] উঁচু। রংটাও কালো। লেখা-পড়াও জানে না! এ কে[illegible]?

রাত্রিবেলা খিল বন্ধ করে বউ বললে—ও লোকটা [illegible]

—কোন্ লোকটা?

—ওই যে-লোকটা আমার টিপ্‌সই নিলে?

—ও একজন উকিল!

বউ বললে—উকিল সই নিলে কেন? কিসের-কোন্ টাকার কথা বলছিলে তুমি ওকে?

আমি কিছু প্রকাশ করলাম না। বউ-এর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। দেখলুম আড়ালে মুখ ঢেকে বউ চুপি-চুপি কাঁদছে।

জিজ্ঞেস করলাম—কাঁদছো কেন?

বুঝলাম সবাই তাকে দেখে কুৎসিত বলেছে বলেই মনে কষ্ট পেয়েছে। তখন তার কান্না থামাবার জন্যে সব ব্যাপারটা খুলে

বললাম। বললাম—দশ লাখ টাকা পাওয়ার কথাটা। কেন তাকে বিয়ে করেছি। আরো বললুম—টাকাতে সব দোষ ঢেকে যাবে। তখন দেখবে সবাই আবার তোমাকে তখন সুন্দরী বলবে। আজ যারা তোমার নিন্দে করলে, কাল তারাই আবার তোমার গুণ গাইবে। সবই বুঝিয়ে বললাম। মনে হলো, সমস্ত শুনে যেন একটু ঠাণ্ডা হলো। আর কান্নাকাটি করে না।

বললাম—তারপর ?

গল্প বলতে বলতে গলাটা বোধহয় শুকিয়ে এসেছিল।

বললে—দাঁড়ান মশাই, একটা বিড়ি ধরাই আগে, গলাটা ভিজিয়ে নিই—তখন থেকে এক নাগাড়ে বলছি তো—

বললাম—তুমি কি আর মুফৎ বলছো হরিপদ ? আমি কি তোম[illegible]টে খাটাচ্ছি বলতে চাও ?

[illegible] টানা বন্ধ রেখে বলে উঠলো—তা, আপনি তো দে[illegible]াত্তোর পাঁচটি টাকা, পাঁচ টাকা দিয়ে আবার কথা শোনাচ্ছেন ? হরিবিলাসবাবুকে এ-গল্পটা দিলে আমাকে খুশী হয়ে বখশিশ দিয়ে দিতেন—

আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম—তা, বখশিশ কি আমি দিই না তোমাকে ? বখশিশ দিই নি কখনও ?

—কী দিয়েছেন শুনি ? কী বখশিশ আমাকে দিয়েছেন ? একবার পুজোর সময় শুধু একটা কাপড় দিয়েছিলেন বউকে, তা ছাড়া আর কখন কী দিয়েছেন শুনি ? হরিবিলাসবাবু গতবারে আমাকে একজোড়া জুতো, আমার ছেলের পাঞ্জাবী, বউ-এর শাড়ি, কত কী দিয়েছেন, তা জানেন ? অথচ আপনি আর হরিবিলাস-বাবু! অথচ তিনি এখনও গাড়ি বাড়ি কিছুই করতে পারেন নি—

আমার আর এ-সব কথা ভাল লাগছিল না। বললাম—বলো, তোমার ও-সব বাজে কথা শোনবার সময় নেই আমার, শেষটা কী হলো, বলো।

হরিপদ রেগে উঠলো। বললে—দাঁড়ান মশাই, আপনি দেখছি ভালো করে বিড়িটাও খেতে দেবেন না—

তারপর বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে সেটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আমারও যেমন হয়েছে, আমি নিজে লেখাপড়া জানলে কি আর আপনাদের দরজায় ধন্না দিই? লেখাপড়া জানলে আমি নিজেই গল্প লিখতুম মশাই, আপনার কাছে এসে এমন করে দরবার করতে হতো না—

বললাম—তা, শেষটা কী হলো বলবে তো? তুমি বড্ড জ্বালাও আমাকে—

—তা, বেশ তো আর জ্বালাবো না, আমি চললুম—হরিবিলাস-বাবুর কাছে গেলে এতক্ষণ সাতটা সিগ্রেট খাইয়ে [illegible]

বললাম—তা, সিগ্রেট তো আমিও দিতে পারি, [illegible]? [illegible]ছো কেন? সিগ্রেট খাবে তুমি?

—এখানেই দেখুন আপনার সঙ্গে আর হরিবিলাস[illegible]র সঙ্গে তফাৎ। সিগ্রেট খাবো কিনা এটাও জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি? এক নাগাড়ে বিড়ি খেয়ে গেলে মানুষের গলা জ্বলে না?

হাসলুম মনে মনে। তাড়াতাড়ি সিগ্রেট আনিয়ে দিলাম দোকান থেকে। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে প্যাকেটটা পকেটে পুরে হরিপদ বললে—আঃ—

তারপর যেন একটু ঠাণ্ডা হলো।

বললাম—বলো, এইবার বলো তোমার শেষটা—

হরিপদ বললে—কত খাটালেন বলুন তো, এ-খাটুনি পাঁচ টাকায় পোষায়? চালের দর একটাকা কিলো, তা জানেন?

আপনিও মশাই কংগ্রেসের মত হয়েছেন, বেশি খাটিয়ে নিয়ে কম মজুরি দিচ্ছেন, আমি বুঝি না কিছু—?

বুঝলাম চাপ দিয়ে হরিপদ বেশি টাকা আদায় করতে চায়। বললাম—আচ্ছা, ঠিক আছে, গল্পটা যদি শেষ পর্যন্ত ভালো লাগে তো না-হয় আরো একটা টাকা দিয়ে দেব—

হরিপদ বললে—আপনি যে মশাই হাসির গল্প চেয়েছেন, দুঃখের গল্প চাইতেন তো দেখতেন আপনাকে আমি কাঁদিয়ে দিতাম—

—ওসব ভণিতা থাক, তোমার গল্পটা বলো, আমার একটু তাড়া আছে—

—তা, আমার কি তাড়া নেই ভেবেছেন? আমারও তো তাড়া থাকতে পারে, আমিও তো কাজের মানুষ, দশটা ফিকিরে ঘুরতে হয় আমাকে—

—থাক্‌গে তারপর?

হরি[illegible]রেটে টান দিলে একবার। তারপর মুখটা গম্ভী[illegible]—শেষটা মশাই বড্ড হাসির—

[illegible]নে?

—হা[illegible]র নয় তো কী! টাকা তো আমি পাই নি। টাকা পেলে কি আমি পাঁচটা টাকার জন্যে আপনার কাছে এসে এই রকম বক্‌বক্‌ করি? টাকা পেলে আপনার নাকের ডগা দিয়ে মটর-গাড়ী হাঁকিয়ে যেতুম না?

—সবই বুঝছি, তুমি বলো এখন হরিপদ, শেষটা বলো! আর পারছি না—

হরিপদ দাঁড়িয়ে উঠলো।

বললাম—দাঁড়ালে কেন?

—যাবার সময় হয়ে এল, দাঁড়াব না—

—তা, শেষটা বলে যাবে তো?

—আরে মশাই, যেমন হয়েছে শালা গভর্মেণ্টের কাণ্ড, তেমনি হয়েছে শালা পোষ্টাপিসের কাণ্ড। কী সব্বনাশটা আমার করলে বলুন তো?

—কেন পোষ্টাপিস তোমার কী সর্বনাশ করলে?

—পোষ্টাপিসই তো গণ্ডগোলটা বাধালে মশাই, নইলে আমাকেও আর অত কাণ্ড করে ওই কালো-কুচ্ছিৎ বউ বিয়ে করতে হতো না, এত ভোগাস্তিও হতো না আমার—বিয়ে না করলে আজ পায়ের ওপর পা দিয়ে আয়েস করে কাটাতে পারতুম—

—কী রকম?

—তবে শুনবেন?

বলে হরিপদ ফস্ করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললে। তারপর একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে—তবে শুনুন মশাই, আমি তো বউ নিয়ে এসে দু'হাতে [illegible] করছি আর আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছি। তখন আর আমায় [illegible]? দু'দিন বাদেই তো আমি দশ লাখ টাকা পেয়ে যাচ্ছি! [illegible] হয়ে গেল টাকা আর আসে না। শেষকালে আমি একদিন বউকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলুম। এসে সেই অ্যাটর্নী-অফিসে গেলুম। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। বললাম—কী মশাই আমার টাকা কোথায়? আপনি আমার বউ-এর সই-সাবুদ নিয়ে গেলেন আর টাকা পাঠাবার বেলায় ঢুঁ ঢুঁ?

তা, ভদ্রলোক কী বললে জানেন? বললে—কিছু মনে করবেন না, আমাদের একটা ঠিকে-ভুল হয়ে গিয়েছিল। বুঝুন মশাই, আমার অত টাকা ধার হয়ে যাবার পর বললে কিনা ঠিকে-ভুল হয়ে গিয়েছিল—

—কী ভুল?

হরিপদ বললে—আরে মশাই, বলে কিনা পোস্টাপিসের টেলি-গ্রামের ভুল। বর্মা থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে কলকাতার অ্যাটর্নী-অফিসে, টেলিগ্রামে লিখেছে আলোকণা দাসী, তার বদলে এরা লিখেছে আলোচনা দাসী। ইংরিজীতে সি-এইচ্‌টা ক'ও হয় চ'ও হয়। সেই ভুল হয়েছে আরকি! আর গ্রামের নাম পাক্‌সর, লিখেছে পাত্‌সর। বুঝুন একবার গভর্মেণ্ট অফিসের কাণ্ডটা—ওরা ভুল করবে, আর মাঝখান থেকে আমার মত গরীব লোকের হয়রানি। ছি ছি! দিন মশাই, পাঁচটা টাকা ছাড়ুন, র‍্যাশন নিয়ে গেলে তবে বউ উনুনে হাঁড়ি চড়াবে, এখনও সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি মশাই—দিন দিন—দেরি করবেন না—র‍্যাশনের দোকান আবার বারোটা বাজলে বন্ধ হয়ে যাবে—দিন—

[illegible] হোক বুঝতে পারলাম এ-গল্প হাসির গল্প নয়। তবু হরিপদ এ[illegible] থেকে শেষ পর্যন্ত যে আমার মনকে টেনে রেখেছিল সেটা[illegible] বাহাদুরি! যে কোনও গল্পই হোক, শেষ পর্য্যন্ত যে-গল্প মনকে টেনে রাখে তারও একটা দাম আছে। আমাদের দুঃখ-কষ্টের অবধি নেই। যে-গল্প খানিকক্ষণের জন্যেও সেই দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে রাখে তার কি কম দাম হতে পারে?

তবু গল্পের কর্তব্য সেখানেই শেষ নয়।

গল্প মানুষকে তার নিজেকে জানতে সাহায্য না-করলে মহৎ-শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। যেখানে মানুষের বহির্লোক শেষ হয়েছে, সেখানেই মহৎ গল্পের সুরু। মহৎ গল্প আত্মরূপ দর্শনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বরূপ দর্শন করায়। তাই মহৎ গল্প মাত্রই মহৎ সাহিত্য। অ্যানা ক্যারেনিনা নিজেকে চিনেছিল টলস্টয়ের সাহিত্যে। তাই লজ্জায়-ঘৃণায় আত্মবিলোপ করেছিল, আত্মঘাতী হয়েছিল। আত্মঘাতী হয়ে

অমর হয়ে রইল সে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে। মানুষের মধ্যে যে দেবতা লুকিয়ে থাকেন তাঁকেও আবিষ্কার করা মহৎ সাহিত্যের কাজ। শরৎ-সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি নজির আছে। মানুষ পশুও নয়, দেবতাও নয়! দেবত্ব আর পশুত্বের মিশ্রণে যে জীব তারই নাম মানুষ। তাই মানুষের মধ্যে যে-বৈচিত্র্য তা দেবতাতেও নেই পশুতেও নেই। সাহিত্যে তাই মানুষের বিশ্লেষণ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি। মানুষের বিশ্লেষণ মানে তার চরিত্রের বিশ্লেষণ। সে-বিশ্লেষণ বৈয়াকরণের বিশ্লেষণ নয়, সাহিত্যের অধ্যাপকের বিশ্লেষণও নয়। সাহিত্যিকের বিশ্লেষণ হলো রস-ভাষ্য। এই রস-ভাষ্য সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। রাজ্য বদলায়, রাজত্ব বদলায়, যুগ পালটায়, রুচিও বদলায়, কিন্তু এই রস-ভাষ্যের আবেদন অবিনশ্বর।

যখন ফ্রেনী তালিয়ার খানের গল্পটা শুনেছিলাম তখন তারও একটা রস-ভাষ্য রচনা করবো ইচ্ছে হয়েছিল। শুধু ইচ্ছে হয়েছিল নয়, ভয়ও হয়েছিল।

সব গল্প লিখতে সব সময় ভয় হয় না। কিন্তু আজ তারই গল্পটা লিখতে গিয়ে কেমন যেন সত্যিই ভয় পাচ্ছি। ভয়টা দুর্নামের নয়। ও-ভয় আমার নেই। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কী ভয়? ভয় অন্য কারণে। প্রজাপতিটা যে প্রজাপতির মত হতেই হবে এমন গোঁড়ামি আমার নেই। বাঘটা বাঘের মত না হলেও আমার কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু প্রজাপতিকে দেখবার সময় যদি মনে হয় বাঘ দেখছি, কিম্বা বাঘ দেখবার সময় যদি মনে হয় প্রজাপতি দেখছি, তাহলে বলবো তোমার ড্রয়িং-এ ভুল আছে। আমি তোমাকে শিল্পী বলে মানবো না।

গল্প লেখবার সময়ে চোখের সামনে চরিত্রগুলোর চেহারা আমি

স্পষ্ট দেখতে পাই। অনেক মানুষের নামের সঙ্গে তাদের চেহারার মিল থাকে না। সেটা নামদাতাদের ভুল। কিন্তু গল্প-লেখকরা যখন তাদের গল্পের চরিত্রদের নামকরণ করেন তখন তাতে ভুল হলে আমি আপত্তি করবো। তখন আমি তোমাকে শিল্পী বলবো না।

বালজাক একবার গল্প লিখতে গিয়ে মুশকিলে পড়লেন। ভাল গোছের একটা নাম খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নামের দরকার পড়লেই তিনি বরাবর রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন। বাড়ির নেম-প্লেট দেখে পছন্দসই নাম বার করতেন। কিন্তু সেবার দরকার হয়েছিল একজন আর্টিস্টের নামের। সে নাম কিছুতেই আর মেলে না। শেষকালে একটা নাম পছন্দ হলো খুব। আহা, লোকটা নিশ্চয় আর্টিস্ট, এমন সুন্দর যখন নাম।

বন্ধু ছিল পাশে। তাকে বললেন—যাও তো ভাই, ভেতরে খোঁজ নিয়ে দেখে এসো তো লোকটা কী করে—

[illegible] র থেকে খবর নিয়ে এসে বললে—লোকটা দরজি, দর[illegible] আছে—

[illegible]রি দুঃখ হলো বালজাকের। বাপ-মার দেওয়া এমন চমৎকার নাম পেয়েও লোকটা দরজি হয়ে দিন কাটাচ্ছে! এমন চমৎকার যার নাম তার তো ভায়োলিন বাজাবার কথা, ছবি আঁকার কথা, গান গাইবার কথা। শেষকালে সেলাইএর কল চালাতে হচ্ছে তাকে!

বড় দুঃখ হলো বালজাকের মনে।

তারপর হঠাৎ বন্ধুকে ডেকে বললেন—কুছ্ পরোয়া নেই, চলো ভগবান ওকে মেরে রেখেছে বটে, কিন্তু আমি ওকে ফেমাস করে ছাড়বো, আমি ওকে আর্টিস্ট করে তুলবো—

শেষ পর্যন্ত হয়েছিলও তাই। 'The Unknown Masterpiece' গল্পতে সেই দরজি আর্টিস্ট হয়েই চিরদিন বেঁচে রইল।

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান-এর নাম শুনেও আমার ঠিক সেই রকম

মনে হয়েছিল। পার্শী মহিলা। তিরিশ বছর বয়েস। তারপর আছে দু'হাজার টাকা মাইনে। সব শুনে আমি ফ্রেনী তালিয়ার খান সম্বন্ধে একটা ধারণা মনে মনে পোষণ করে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম দেখতে সুন্দরী। টানা-টানা ভ্রূ, সিল্কের শাড়ির আঁচলটার ওপর একটা ব্রুচ আঁটা। এদিকে ভীষণ স্ট্রিক্ট। কারো সম্বন্ধে দয়া-মায়া নেই। কেবল কাজ আর কাজ!

কিন্তু মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—না ঠিক তার উল্টো—

—কী রকম?

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—অদ্ভুত সুন্দরী! অফিস শুদ্ধু সব স্টাফদের অত্যন্ত ভালবাসতেন, স্টাফরাও ভালবাসতো তাঁকে—মিস তালিয়ার খান-এর নাম করলে ফস্টার জনসন কোম্পানীর অফিসের সবাই খুশী হয়ে উঠতো—

ফস্টার জনসন কোম্পানী বোম্বাই-এর নামজাদা পাবলিসিটি ফার্ম। মিস তালিয়ার খান সেই ফার্মের একজন বিজনেস [illegible]জিকিউটিভ। প্রত্যেকদিন যখন নিজের হাতে গাড়ি চালিয়ে মিস [illegible]লিয়ার খান অফিসে আসতো তখন গেট-এর দারোয়ান থেকে সুরু [illegible] গা[illegible] [illegible]তলা তেতলার সব স্টাফ সামনে তাকে দেখলেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াত। মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান অফিসে নিজের চেয়ারে এসে না বসলে অফিসটাই যেন মানাত না। সকলের মনে হতো যেন সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। কারো কাজে মন বসতো না। কাজের আউটপুটও কমে যেত।

জুনিয়ার পার্টনার মিস্টার জনসন জিনিসটা বুঝতো। বুঝতো যে ফার্মের ক্লায়েন্টরাও যেন মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান-এর অনুপস্থিতিটা অনুভব করছে। ইণ্ডিয়ার বড় বড় ফার্মের রিপ্রেজেনটেটিভরা এসে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানকে না দেখলে যেন অখুশী হয়। উস-খুশ করে। একটু কম কথা বলে। একটু কম কাজ দেয়। একটু অসন্তুষ্ট হয়।

অবশ্য মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান এমনিতে কখনও কামাই করে না। ঠিক সকাল ন'টার সময় মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান-এর গাড়িটা এসে ফস্টার জনসন কোম্পানীর গ্যারাজে ঢোকে। আর নিজে সে লিফট-এ উঠে সোজা নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে।

কামাই করবার কোনও সুযোগই নেই মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান-এর। নিজের বাড়িতেও কোনও ঝামেলা নেই। একলা মানুষ আর ঝি-চাকর-আয়া, এই পর্যন্ত।

মিস্টার সেনগুপ্ত বেশ বয়স্ক মানুষ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম--আপনি কি ওই ফস্টার জনসন অফিসেই কাজ করতেন নাকি আগে?

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—না—

—তাহলে আপনি মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান সম্বন্ধে এত জানলেন কী করে?

[illegible]স্টার [illegible]নগুপ্তকে আমি অনেক দিন থেকে জানতাম। দশ বছর আগে [illegible]গু থেকে ফিরেছেন। সেখানেই এক বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে প[illegible]য়। তাকেই তিনি বিয়ে করেন। সে অনেক দিনের কথা। অনেক বার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই খুব সুখী। অন্ততঃ বাইরে থেকে দেখে তাই-ই মনে হতো আমার। আর আমার ধারণা যে ভুল নয় তার প্রমাণও বহুবার পেয়েছি।

আমাদের পাড়াতেই মিস্টার সেনগুপ্ত বাড়ি করেছেন। সাধারণ বাড়ি নয়। বিস্তর মাথা খাটিয়ে ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে প্ল্যান করিয়ে তবে বাড়ি করেছেন। স্ত্রী আর চাকরি করেন না এখন। করবার দরকার হয় না বলেই করেন না, কিম্বা মিস্টার সেনগুপ্ত হয়ত চান না যে স্ত্রীও চাকরি করুক।

ঘটনাচক্রেই আলাপ হয়ে গিয়েছিল একদিন মিস্টার সেনগুপ্তের

সঙ্গে। পাড়ার ছেলেদের এক মিটিংএ আমাকে ধরে করে দিয়েছিল সভাপতি আর মিস্টার সেনগুপ্তকে প্রধান অতিথি। সেইখানেই সূত্রপাত। আর সেই সূত্রপাত থেকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতে বেশি দেরি হয়নি।

মিস্টার সেনগুপ্ত সেই জাতের লোক--যাদের বাইরে থেকে দেখে মনে হয় অহঙ্কারী। মনে হয় বুঝি অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে তাদের ঘৃণা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে মানুষের সঙ্গ কামনা করে, মানুষ পেলে তারা বেঁচে যায়। বাইরের কোট-প্যাণ্ট-নেকটাই তাদের আসলে ছদ্মবেশ। সেই ছদ্মবেশটাই কারোর বেলায় সত্য হয়ে যায় সারা জীবন। সে ছদ্মবেশ তারা আর সারা জীবনে ছাড়তে পারে না। বলতে গেলে ছদ্মবেশটাই স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় তাদের।

কিন্তু মিস্টার সেনগুপ্ত যে এত অমায়িক তা আমি ছাড়া আমাদের পাড়ার আর কেউই জানতে পারলো না। কারণ পাড়ার সকলকে নিয়ে হৈ হৈ করে গল্প করার মত ক্ষমতা মিস্টার সেনগুপ্তর ছিল না।

মিসেস সেনগুপ্তও স্বামীর মত বড় নিরহঙ্কার, বড় অমায়িক মহিলা। দু-জনেই কারো সঙ্গে হো-হো করে [illegible] গল্প করতে পারতেন না বটে, কিন্তু যেটা পারতেন সেটা তাঁদের চরিত্রের একটা সম্পদ। আমি মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে না গেলে সত্যিই আন্তরিক দুঃখ পেতেন। এবং দুঃখটা যে সত্যিই আন্তরিক সেটা তাঁরা অন্যদের মত মুখ ফুটে না বললেও বুঝতে পারতাম।

বেশ সাজানো গোছানো ড্রয়িং-রুম। ছোট একটা কাঠের টবে ক্যাকটাস। একটা হাতে-আঁকা-পেনটিং দেয়ালের গায়ে। ঘর-সাজানোর মধ্যেও যেন কোথায় একটা বৈশিষ্ট্য লেগে থাকতো। শুধু ঘর সাজানোই নয়, সাজ পোষাকের মধ্যেও বেশ ছিম-ছাম ভাব।

মিস্টার সেনগুপ্ত একদিন বলেছিলেন—আপনি তো কেবল হিস্ট্রির ইন্টারপ্রিটেশন নিয়েই উপন্যাস লেখেন দেখছি—

আমি বলেছিলাম—যখন যেটা লিখতে ভাল লাগে সেইটিই লিখি, আমি তো কারো দাসত্ব করি না—

—কিন্তু কোনও ক্যারেকটার নিয়ে লেখেন না ?

আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি কথাটা।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—ক্যারেকটার মানে ?

মিস্টার সেনগুপ্ত বলেছিলেন—হিস্ট্রির যেমন ইণ্টারপ্রিটেশন আছে, ক্যারেকটারেরও তেমনি ইণ্টারপ্রিটেশন থাকে।

—তা তো থাকেই !

মিস্টার সেনগুপ্ত বলেছিলেন—ধরুন এমন অনেক ক্যারেকটার থাকে সংসারে, যে-ক্যারেকটার দেশ-কালের জিওগ্রাফিতে আটকে থাকে না, যে-ক্যারেকটার ইণ্ডিয়াতেও সত্যি, আমেরিকাতেও সত্যি আবার পেরুতেও সত্যি ! বাঙ্গালী, গুজরাটি, পার্শী, আসামী, মারহাটি, অন্ধ্রদের মধ্যেও সত্যি—অর্থাৎ যাকে বলে হিউম্যান ডকুমেণ্ট ?

বললাম—[illegible] আমি লিখেছি এককালে। আমার পাঠকরা তখন বলতো [illegible] নাকি মেয়ে-চরিত্র সম্বন্ধে স্পেশালিস্ট ! যত রকমের নারী-চরি[illegible] তাই নিয়ে বই লিখেছিলাম—তার নাম দিয়েছিলাম কন্যাপক্ষ—

—এখন আর লেখেন না ?

—না।

—কেন ?

বললাম—লোকে ভাবলো আমি বুঝি ও-ছাড়া আর কিছু লিখতে পারি না। আমি যে সব কিছু নিয়েই লিখতে পারি তার প্রমাণ দেবার জন্যে একটা বই লিখলুম তার নাম দিয়েছিলুম প্রথম পুরুষ—তাতে সবই পুরুষ-চরিত্র—

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—তা আর কি নারী-চরিত্র নিয়ে লিখবেন না ঠিক করেছেন ?

বললাম—তা কি বলতে পারি ?

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—তা যদি লেখেন তাহলে আর একটা ফিমেল-ক্যারেকটার আপনাকে দিতে পারি—

বললাম —বেশ তো দিন না !

আসলে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান সম্বন্ধে সেই আমার প্রথম জ্ঞান। মিস্টার সেনগুপ্তই আমাকে একদিন মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান সম্বন্ধে সমস্ত খুলে বললেন। আর আমিও ভেবে দেখলাম আগে অনেক নারী চরিত্র নিয়েই লিখেছি বটে, কিন্তু মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের মত চরিত্র নিয়ে তো কখনও লিখিনি।

ফ্রেনী তালিয়ার খান সম্বন্ধে যা জানা সম্ভব তার সবটা মিস্টার সেনগুপ্ত জেনে নিয়েছিলেন। ছোটবেলাকার জীবনে অর্থ ঐশ্বর্য কিছুরই অভাব ছিল না তার। পার্শী সমাজের অবস্থাপন্ন লোকের মেয়ে। শুধু মেয়ে নয়, লেখা-পড়া জানা মেয়ে। ফ্রেনীর বাবার তখন অগাধ ঐশ্বর্য।

ফ্রেনী বলতো—টাকার তো কখনও অভাব হয়নি [illegible] আমার—

যারা শুনতো, তারা সবাই অভাবগ্রস্ত ঘরের লোক [illegible] কিছু ছেলে, কিছু মেয়ে। সবাই চাকরি করতে এসেছিল [illegible] জনসন কোম্পানীর অফিসে। তারা সবাই একদিন মেট্রিক পাশ করেছে, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে, গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। তারপর ফস্টার জনসন কোম্পানীর অফিসে চাকরি করতে এসেছে। টাকার জন্যেই চাকরি করতে এসেছে। দুশো থেকে তিনশো হবে, তিনশো থেকে চার শো। শেষে দু হাজারও মাইনে হয়ে যেতে পারে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের মত।

তবে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের টাকার দরকারও নেই অত। পার্শী সমাজের অত বড়লোক বাবা-মা অনেক টাকা মস্ত বাড়ি রেখেই মারা গেছেন। সেই সমস্ত টাকার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান।

টাকার জন্যে অবশ্য কারো কিছু মনে হবার কথা নয়। টাকা কারো থাকে, কারো বা থাকে না। কেউ টাকা উত্তরাধিকারী সূত্রে পায়, কেউ নিজের পরিশ্রমে টাকা উপায় করে। অবাক হয় সবাই অন্য কারণে।

সবাই বলাবলি করে—কিন্তু মিস খান বিয়ে করেনি কেন ভাই—?

কেউ বলে—অত টাকা আছে বলেই হয়ত বিয়ে হয়নি!

কে জানে কোনটা সত্যি! টাকা যেমন মেয়েদের না-থাকলে বিয়ে হয় না, টাকা থাকলেও তেমনি আবার বিয়ে হয় না!

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের বেলায় সত্যিই তাই হয়েছিল। যে-কোনও ছেলেই মিশতে আসতো ফ্রেনীর সঙ্গে, ফ্রেনীর মনে হতো হয়ত তারা তার টাকার জন্যেই তাকে ভাল-বাসার ভাণ করছে—! তার যৌবন নয়, তার রূপ নয়, তার স্বভাব-চরিত্র কিছুই [illegible]য়, তার টাকাই হলো তার সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক—এর চে[illegible] মে[illegible]র জীবনে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে····?

সব[illegible]কে সন্ধ্যে পর্যন্ত, এমন কি অনেক রাত্ত পর্যন্ত টাকা-পয়সা নিয়েই ফ্রেনীর সময় কেটে যেত। মালাবার হিলস-এর ওপর ফ্রেনীর অত বড় ফ্ল্যাট-বাড়িটার কি কম আয়? এক-একটা ফ্ল্যাট সাতশো আটশো টাকা মাসে ভাড়া। এই রকম কুড়িটা ফ্ল্যাট, কুড়ি ইনটু আটশো—কত হয় গুণ করুন?

আর টাকা হওয়া মানেই ঝঞ্ঝাট হওয়া। অর্থাৎ দরকারের চেয়ে বেশি টাকা হওয়া। ল'ইয়ার, এ্যাটর্নী, অ্যাকাউনটেন্ট আর টেনেণ্ট নিয়েই জীবন দুর্বিসহ হওয়ার কথা। ধরুন, ফ্রেনীর বয়স যখন সতেরো বছর, সেই সময়েই সে এতগুলো টাকা আর এত বড় প্রপার্টির মালিক হয়ে গেল।

ফ্রেনীর অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের অভাব ছিল না।

আত্মীয়-স্বজনরাও সবাই অর্থবান।

কিন্তু সে ব্যাপারেও টাকাই বাধা হয়ে দাঁড়াল ফ্রেনীর জীবনে!

যদি কেউ মনে করে ফ্রেনীর টাকার লোভেই আমরা তার দেখা-শোনা করছি? যদি কেউ মনে করে আমবা তার টাকার ভাগ পাবার আশা রাখি?

সুতরাং আর কেউ আপন রইল না বলতে গেলে তার।

গোটাকতক চাকর ঝি আয়া নিয়েই সুরু হয়েছিল মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের যৌবন। সে অনেক দিন আগেকার ঘটনা। তখন আমার সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের।

—আপনার সঙ্গে মানে? আপনি কি চিনতেন নাকি মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানকে?

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—আসলে আমি চিনতাম না, আমি কখনও মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানকে দেখিও নি—আমি শুধু শুনেছি—

তারপর মিসেস সেনগুপ্তের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—ওঁর কাছে শুনেছি—

—আপনি? আপনিই চিনতেন নাকি?

মিসেস সেনগুপ্ত মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন।

স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন—কেন তুমি আবার সেই সব কথা পাড়ছো?

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—তা হোক, আমি স্টোরি-রাইটারকে বলছি, অন্য কাউকে তো বলছি না—

স্টোরি-রাইটার হওয়ার পর থেকেই এই রকম শুনতে হয়েছে অনেক গল্প। অনেক লোকের গোপন কাহিনী। যা কারো কাছে বলা যায় না, বলা উচিত নয়, এবং বলা বিপজ্জনক সেই সব কাহিনী।

লোকে বিশ্বাস করে নির্বিবাদে আমাকে বলে গেছে। আমি কখনও শুনেছি, কখনও তা নিয়ে গল্পও লিখেছি। আবার কখনও শুনিই নি, গল্পও লিখিনি!

এবারও লিখতাম না।

ফ্রেনী তালিয়ার খান তেমনি মহিলা নয় যাকে নিয়ে সত্যিই কোনও গল্প হয়। কিন্তু চরিত্রটা একটু অন্য ধরনের অর্থাৎ এতদিন যা নিয়ে লিখেছি, মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান তা নয়। মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান শুধু যে এ যুগের মেয়ে তা-ই নয়, এ যুগের ফ্রাস্ট্রেশনও বটে।

শুধু যে টাকার প্রাচুর্য তাই-ই নয়, বোধহয় মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের যৌবনের প্রাচুর্যও ছিল। যার এত যৌবনের প্রাচুর্য, তার এত টাকার প্রাচুর্য বোধহয় থাকা উচিত ছিল না।

যে-বয়েসে ইয়াং-ম্যানরা ইয়াং-গার্লদের কাছে আসতে চায়, সে-বয়েস একদিন মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানেরও ছিল। সেই বয়েসের দুর্বলতাও ছিল [illegible]র মনে আর শরীরে। বোম্বাইএর সচ্ছল সমাজের ছেলেরা আসতো তার কাছে।

কথায় [illegible] বলতো—চলুন না সিনেমায় যাই—

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান বলতো—যাবেন?

—চলুন না, বেশ রিল্যাক্স করা যাবে—

—আজকেই যাবেন?

—কেন আজ কি আপনার কোনও কাজ আছে নাকি?

—না, কাজ নেই, কিন্তু কী সিনেমা?

ছেলেরা বলতো—তা জানি না, সিনেমা হাউসে গিয়েই দেখবো কী সিনেমা হচ্ছে—

একটু একটু ইচ্ছেও হতো মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের। কী যেন ভাবতো। একবার দ্বিধা করতো একটু। ভেবে দেখতো কেন তাকে নিয়ে সিনেমায় যেতে চায় তারা। তাকে সিনেমায় নিয়ে যাবার

জন্যে কেন এত আগ্রহ তাদের! সে কি তার স্বাস্থ্য? না কি তার টাকা? হয়ত দুটোই। দুটোর দিকেই তাদের সকলের লোভ! তাদের চোখগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখতো। মনে হতো চোখের দৃষ্টিতে তাদের লোভ ফুটে বেরোচ্ছে। মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানকে যেন গিলতে চাইছে।

তারপরে বলতো—না আজকে থাক,—

—কেন? কী হলো আপনার?

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান বলতো—না, আজকে শরীরটা ভাল লাগছে না—কাল যাবো—

কালের দাবী মেটাবার জন্যে তৈরিও হতো, শাড়ি পরতো, গয়না পরতো, মুখে গালে ঠোঁটে কসমেটিকস লাগাতো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার নিজের চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতো। অন্য লোকের চোখে নিজেকে কেমন দেখাবে তা নিয়ে মাথাও ঘামাতো অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু ঠিক যখন সময় হয়ে আসতো তখন যেন আর কিছু ভাল লাগতো না। তখন আবার শাড়ি খুলে ফেলতো, গয়না খুলে ফেলতো, খোঁপা খুলে ফেলতো। মুখের গালের ঠোঁটের কসমেটিকস মুছে ফেলতো!

কী হবে সিনেমায় গিয়ে!

কী হবে এই সেজে-গুজে পরের মন ভুলিয়ে। সবাই কেবল নিতে চায়। দেবে না কেউ কিছু। কেবল নেবে। আমার টাকা নেবে, আমার যৌবন নেবে। আমাকে নেবে, আমার নিজের চেয়ে আমার টাকা আমার স্বাস্থ্যের দিকেই লোভ বেশি ওদের।

যথারীতি বিকেল বেলা গাড়ি নিয়ে এসেছে ছেলেটা। গাড়ি থেকে নেমে তর-তর করে সোজা সিঁড়ি দিয়ে ড্রয়িং-রুমে এসে বসতেই মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের চাকর এসে খবর দিলে—মেমসাহেব নেহি যায়েঙ্গে হুজুর—

কেমন যেন হতাশ হয়ে যায় ছেলেটা!

পার্শী সমাজের সব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে তারা। ছোটবেলা থেকে ঐশ্বর্যে আদরে মানুষ হওয়া। চিরকাল না-চাইতেই সব পাওয়া তাদের স্বভাব।

কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল চাকরের কথা শুনে।

পকেট থেকে সোনালী সিগারেটের কৌটা বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে। মনের আড়ষ্টতাটা কাটাবার জন্যে সোঁ-সোঁ করে ধোঁয়া ছাড়লে।

তারপর একবার জিজ্ঞেস করলে—মেমসাহেব কিধার?

চাকরটা বললে—হুজুর মেমসাহেবকী তবিয়ৎ খারাব—

এর পরে আর কথা নয়। আর দাঁড়িয়ে থাকা মানায়ও না, দাঁড়িয়ে থাকা উচিতও নয়। তর তর করে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বাড়িতে টিউটর আসতো। গান-বাজনা শেখাবার জন্যেও টিউটর আসতো। পিয়ানোটাই ভাল করে শেখবার ইচ্ছে ছিল মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের। একদিন বড় হয়ে জীবনে অনেক উন্নতি করতে হবে। উন্নতি কথাটার মানে অনেক রকম হতে পারে। কেউ উন্নতি করতে চায় অর্থে, কেউ ক্ষমতায়, কেউ স্বাস্থ্যে, কেউ আরো নানা ভাবে।

—তুমি কোন লাইনে যেতে চাও?

—তার মানে?

—তোমার লাইফের এ্যামবিশন কী?

টিউটরের কথায় মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান নিজের মনের মধ্যে খুঁজতে সুরু করতো। কী হতে চায় সে? কী হওয়া উচিত?

কোনটা হলে বেশ ভাল হয়! কী হতে পারলে সবাই ভাল বলবে, সবাই প্রশংসা করবে।

ভেবে ভেবে কিছুই বার করতে পারতো না মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান! সবই তো তার আছে। টাকা আছে, স্বাস্থ্য আছে, সকলকে ভালো লাগাবার মত তার রূপ আছে। তবে আর কী চাই?

—জানেন, কী মুশকিলেই যে পড়েছি!

কাউকে বলবার লোক না পেয়ে টিউটরকেই নিজের দুঃখের কথা বলতে হয়।

—কেন? কী হলো আবার তোমার?

—সবাই বড্ড আমার দিকে এ্যাটেনশন দেয়!

—কেন? কী জন্যে এ্যাটেনশন দেয়?

ফ্রেনী বলে—কা জানি! আমি বুঝতে পারি না, এত মেয়ে থাকতে আমার দিকে কেন সবাই এত এ্যাটেনশন দেয়—

টিউটর বলেন—দ্যাট ইজ ব্যাড—

—কিন্তু আমার কী দোষ! আমাকে নিয়ে সবাই সিনেমায় যেতে চায়, আমাকে নিয়ে মোটর-ড্রাইভ করতে চায়, আমাকে নিয়ে জুহু বিচ-এ বেড়াতে চায়—

টিউটর বলেন—খুব সাবধান থাকবে তুমি। ইউ আর ভেরি ইয়াং। এই এজটাই ডেঞ্জারাস—এই বয়সে স্লিপ করবার চান্স—

—কিন্তু ওরা আমার দিকে কেন এত এ্যাটেনশন দেয় মিস? আমার কী আছে?

—তোমার কী নেই?

—আমার টাকার লোভ?

—ওরা জানে সেটা। তোমাকে বিয়ে করলে অনেক টাকা পাবে। তা ছাড়া পাবে তোমাকে, তোমাকে পেতে কোন ইয়াং-ম্যানের না ইচ্ছে হবে?

তারপর মিস একবার ফ্রেনীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—তোমার এজ কত?

—সেভেনটিন!

—এইটেই তো আসল বয়েস! এই বয়েসটাতেই খুব সাবধানে থাকতে হয় মেয়েদের। বি ভেরি কেয়ারফুল।

ফ্রেনী বলে—এক-একদিন যখন মেরিন ড্রাইভে যাই বেড়াতে. তখন অনেকে আমাকে ফলো করে—আমি দেখেছি আমাকে নিয়ে তারা গসিপ করে—

—মোস্ট ন্যাচারাল!

—কেন? মোস্ট ন্যাচারাল কেন?

—বা, তুমি যে বিউটিফুল গার্ল। তোমার মত বিউটিফুল গার্ল ক'জন আছে? তোমার মত ফিগারই বা ক'জনের আছে? তোমার মত চোখ, আই-ব্রো, কমপ্লেকশন কটা মেয়ের আছে এখানে? তাই তো বলছি—বি ভেরি কেয়ার ফুল—

চারিদিক থেকে সাবধান-বাণী শুনে শুনে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান সেই সতেরো বছর বয়স থেকেই সচেতন হয়ে উঠেছিল। যাকে বলে অতি-সচেতন। সেই মেয়ে যখন সতেরো থেকে সাতাশে পৌঁছুল তখনও সতর্ক হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলো। তারপর সাতাশ থেকে যখন সাঁইত্রিশে পৌঁছুল, তখনও তাই। সবাই কেবল এ্যাটেনশন দেয় তার দিকে। তার মুখ গাল ঠোঁটের দিকে এ্যাটেনশন দেয়, তার যৌবনের দিকে এ্যাটেনশন দেয়, তার টাকার দিকেও এ্যাটেনশান দেয়।

অফিসের ক্লায়েন্ট! ফস্টার জনসন কোম্পানীর বড়-বড় ক্লায়েন্ট সব কেউ এক লাখ দু'লাখ টাকার কাজ দেয় কোম্পানীকে। গুজরাটি ফার্ম। তারা আসে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের চেম্বারের ভেতরে। পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ফ্রেনীর নজরে পড়ে।

এক-একদিন বলেই বসে।

বলে—আমার মুখের দিকে চেয়ে অমন করে কী দেখছেন মিস্টার দেশাই ?

মিস্টার দেশাইদের মুখ লাল হয়ে ওঠে লজ্জায়।

তারা বলে—আমাকে ক্ষমা করবেন মিস তালিয়ার খান, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম, আই ওয়াজ আন-মাইণ্ডফুল —

এর পরে আর সহজভাবে কথা বলতে পারত না পুরুষমানুষরা। যত পুরুষ-ক্লায়েন্ট আসতো মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের কাছে, বিজনেসের কাজে সবাই ঠিকে ভুল করে চলে যেত। মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের সঙ্গে দর কষাকষিতে হেরে চলে যেত পুরুষ-ক্লায়েন্টরা। ফাইভ-পার্সেন্টের জায়গায় টেন-পার্সেন্ট সই করে দিয়ে চলে যেত। তাতে লাভ বই লোকসান হতো না। বিশেষ করে কোম্পানীর। ফস্টার জনসন কোম্পানীর বোম্বে অফিসেরই লাভ। আর মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের লাভ আসতো টাকার দিক দিয়ে। মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের ধাপে ধাপে মাইনে বেড়ে যেত।

ফস্টার জনসন কোম্পানীর অফিসে যখন ঢুকেছিল ফ্রেনী, তখন পোস্ট ছিল তার থার্ড একজিকিউটিভ। মাইনে ছিল পাঁচশো টাকা মাসে। তার পরে হলো সেকেণ্ড একজিকিউটিভ। তখন মাইনে বেড়ে হলো হাজার। শেষকালে ফার্স্ট-একজিকিউটিভ। তখন টু-থাউজ্যাণ্ড।

তখন কোম্পানীর অবস্থা খুব ভালো।

ফ্রেনী তালিয়ার খানের নামও ছড়িয়ে পড়েছে তখন বিলেতের হেড-অফিসে।

তখন যারা ফ্রেনীকে দেখেছে, তারা জানে সে কী তেজ মেয়ের!

তেজ বলে তেজ! ফ্রেনী তালিয়ার খানের বেবী-স্টুডিবেকার

গাড়িখানা বোম্বের রাস্তা দিয়ে যখন পঞ্চাশ মাইল স্পীডে ছুটে চলতো তখন তার পাশের এ্যালসেশিয়ান কুকুরটাও ভয়ে থর থর করে কাঁপতো।

বলতে গেলে শেষকালে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের তখন ওই-ই ছুটো সখ। এক কুকুর, আর দুই গাড়ি। কাট-আউট খুলে দিয়ে গাড়ি চালানোই ছিল ফ্রেনীর নেশা। শব্দ শুনলেই লোক বুঝতে পারতো—ফ্রেনী চলেছে। আওয়াজ শুনে পাশ ফিরলেই দেখা যেত ফ্রেনীর বেবী-স্টুডিবেকার, আর তার জিভ বের করা এ্যাল-সেশিয়ান।

নেশাটা অনেক দূর গড়ালো।

একবার কোর্টে গিয়ে ফাইন দিয়ে এসেছিল ফ্রেনী। পঞ্চাশ টাকা ফাইন। কিন্তু সেই ফাইন দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবার পথেই আবার পুলিশে গাড়ির নম্বর টুকে নিলে।

ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ার্নিং দিলে।

বললে—এবার কোর্টে এলে একশো টাকা জরিমানা দিতে হবে—

তাতেও পেছপা নয় ফ্রেনী। কতবার যে ফাইন দিয়েছে, আর কতবার যে পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাকে যেতে হয়েছে, তার আর হিসেব নেই ফ্রেনীর জীবনে।

ফস্টার জনসন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে-ছিল—তুমি অত র‍্যাশ-ড্রাইভ করো কেন ফ্রেনী?

ফ্রেনী বলেছিল—অত স্লো-লাইফ আমার ভাল লাগে না মিস্টার প্যাটারসন—

যে লাইফ স্লো, তার ওপর কোনও আকর্ষণ ছিল না ফ্রেনীর। লাইফ ফাস্ট না হলে মজা কোথায়? প্রচুর স্বাস্থ্য প্রচুর যৌবন প্রচুর টাকা নিয়ে ফ্রেনী যেন পৃথিবীতে তোলপাড় করে বেঁচে থাকতে চাইত।

তখনকার বোম্বেতে এখনকার মত এত মানুষের ভিড় ছিল না। এখানে একখানা বাড়ি। ওখানে দুখানা। তাতেও ফ্রেনীর মনে হতো বোম্বেতে যেন মানুষের বড় বেশি ভিড়। কেন আরো বড় হলো না সিটি। আরো চওড়া হলো না রাস্তাগুলো। কেন গাড়িখানা নিয়ে সত্তর মাইল স্পীডে চালানো যায় না। কেন আরেবিয়ান-সীর ওপর সোজা ভাসা যায় না গাড়ি নিয়ে।

গাড়িখানা গ্যারেজে পুরে যখন ফ্রেনী বাড়ি ফিরতো, তখন সারা গায়ে তার ঘাম ঝরছে। সমস্ত শরীরটা থর-থর করে কাঁপছে তার। সেই অবস্থাতেই সোজা বাথরুমে ঢুকে পড়তো। টাবের হট ওয়াটার ছেড়ে দিত। বাথরুমের বাইরে শোনা যেত ফ্রেনী সুর করে গান ধরেছে।

তারপর ঘণ্টা খানেক পরে যখন ফ্রেনী বেরোত, তখন মুখ-চোখ-গাল-গলা সব লাল হয়ে গেছে তার।

যেন এতক্ষণ বাথরুমে ঢুকে সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—এ-সব হলো মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের আদি ইতিহাস। মানে ফ্রেনীর জীবনের প্রোলোগ। আসল উপাখ্যান আরম্ভ হওয়ার আগের চ্যাপটার।

লোকে বলত—ফ্রেনীর ডগের জন্যেই ফেনীর লাভার জুটছে না—

আবার কোনও কোনও লোক বলতো—ফ্রেনীর গাড়ির জন্যেই বর জুটছে না—

পার্শী সমাজের যারা মাথা, তাদের কানেও গেল। তারা প্রথম-প্রথম ভেবেছিল একটা কিছু উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে শুধরে দেবে মেয়েটাকে।

ওর বাবাকে তারা চিনতো। মাকেও চিনতো। পার্শীদের সমাজে বলতে গেলে সবাই-ই সবাইকে চেনে।

পরস্পরের সঙ্গে কোথাও দেখা হলে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের কথাও হতো।

কিন্তু অনেকেই বলতো—ফ্রেনীর কথা বোল না—ও বয়ে গেছে—

কেউ কেউ বলতো—ওর ম্যারেজ হওয়া দরকার—

আবার কেউ বলতো—কিন্তু কে ম্যারি করবে ওকে? তেমন ছেলে বোম্বেতে কে আছে?

সত্যিই তেমন ছেলের সন্ধান কারো জানা ছিল না।

সত্যিই তো, ও-মেয়েকে কে সামলাবে! ওকে সামলাতে গেলে ও ভাববে ওর টাকার লোভেই ছেলেরা এসে জুটছে। তা ছাড়া ওর ওই এ্যালসেশিয়ান, ওর ওই বেবি-স্টুডিবেকার? ও সব সামলাবে কে?

যে-মেয়ে সত্তর-মাইল স্পীডে স্টুডিবেকার চালায়, সে মেয়ে কত মাইল স্পীডে মানুষকে চালাবে, তার হিসেব কে করবে?

তা সত্যিই অফিসের মধ্যেও যেন চরকি-বাজি চালিয়ে দেয় মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান।

ফস্টার জনসন কোম্পানীর অফিসটা থার্ডফ্লোরে, লিফটে উঠে কোরিডোর দিয়ে সোজা ঢুকতে হয় অফিসের ভেতরে। সেই খানেই বসে থাকে চাইনিজ-পুতুলের মত রং মাখা দু'জন রিসেপশনিস্ট। বগল-কাটা, পেট-কাটা ব্লাউজ পরা, ছাপানো শাড়িটা কাঁধ থেকে অনবরত খসে যাচ্ছে তাদের। এমনিতে যখন কেউ থাকে না, তখন তারা টেলিফোনের বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তা না হলে ভ্যানিটিব্যাগ থেকে আয়না বার করে মুখ দেখে, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায়, আর দু হাত তুলে ঘন-ঘন খোঁপা ঠিক করে নেয়।

এরা দু জন অফিসের শোভা।

অফিসের ক্লায়েণ্টরা এলে এরাই হেসে তাদের অভ্যর্থনা করে। তারপরে টেলিফোন করে ভেতরে কর্তাদের খবর দেয়। তখন ডাক আসে ভেতর থেকে।

এ সব কোম্পানীতে সুন্দরী মেয়ে না হলে চাকরিই হয় না। প্রজাপতির মতন তারা অফিসের সামনের ঘরে রোজ নতুন-নতুন শাড়ি পরে বসে থাকবে। তারপর অফিস ছুটি হবার পর কার সঙ্গে কোথায় কোন হোটেলে গিয়ে রাত কাটাবে, তা-ও ঠিক হয়ে যাবে অফিসের ভেতর।

কিন্তু এমন মেয়েরাও হঠাৎ এক সময়ে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। বাইরে জুতোর আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারে ও মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান।

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান যখন আসে, অনেক দূর থেকেই তার আওয়াজ পাওয়া যায়।

—গুডমর্নিং!

—র্মানং!

মেয়েরা বেশ সবিনয়েই গুড মর্নিং করে। কিন্তু মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান যেন সে দিকে তাকিয়েও তাকায় না। তার যেন অত সময় নেই। হিল-তোলা জুতোর খটা-খট শব্দ করতে করতে অফিসের ভেতরে গিয়ে ঢোকে। তারপর নিজের ঘরখানায় গিয়ে ঢুকতেই চাপরাশি এসে টেবিল গুছিয়ে দেয়। এক গ্লাস জল এনে দেয়।

তারপর ইলেকট্রিক সুইচটা টিপতেই স্টেনোগ্রাফার মেয়েটি এসে হাজির হয়।

বলে—টেক দিস ডিকটেশন—

এই স্টেনোগ্রাফার মেয়েটিই যেন এ অফিসে ব্যতিক্রম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—হঠাৎ এক ঝাঁক হাঁসের মধ্যে যেন একটা বক এসে জুটেছে। সবাই কাঁধ-কাটা, পেট-কাটা ব্লাউজ পরে, সবাই খাটাউ-মিলের শাড়ি পরে ঘুর ঘুর করতে করতে অফিসে আসতো। কিন্তু এ মেয়েটি বোধহয় তখনো বোম্বের হালচাল ভাল করে রপ্ত করতে পারে নি, আর কি!

—মানে নমিতা সেন খাঁটি বাঙলা দেশের মেয়ে। ঘটনাচক্রে এসে পড়েছিল বোম্বেতে।

বলে থামলেন মিস্টার সেনগুপ্ত।

—নমিতা সেন?

—হ্যাঁ, নমিতা সেন। সমস্ত বোম্বের এ্যাট্‌মোসফিয়ারের মধ্যে নমিতা সেন যেন বড় মিস্‌ফিট্।

—কেন, মিস্‌ফিট্ কেন?

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—দেখুন, নমিতা আসলে বোম্বেতে চাকরি করবে বলে বোম্বেতে যায়নি। সে কাকার সঙ্গে বোম্বাইতে গিয়েছিল বেড়াতে। কাকা কাকিমা আর খুড়তুতো বোন ছিল ছোট-ছোট। সেই হোটেলে উঠে দু চার দিন থাকবে, শহর দেখবে, তারপর সেখান থেকে যাবে অজন্তা ইলোরা, আরো অনেক জায়গা।

হঠাৎ সেখানে মারা গেল কাকা।

বিদেশে বেড়াতে এসে এ-রকম এ্যাকসিডেণ্ট বড় একটা হয় না।

যে ডাক্তার এসেছিল দেখতে, তারও বোধহয় একটু দয়া হয়েছিল। টাকাকড়ি যা কিছু সঙ্গে ছিল সব খরচ হয়ে গিয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। হাতে তখন আর এমন পয়সা নেই যে কলকাতায় ফিরে আসবে তারা।

সেই ডাক্তারই ফ্রেনীকে খবরটা দিলে কথায়-কথায়।

ফ্রেনী বললে—কিছু টাকা দিলে কি তাদের উপকার করা হবে?

ডাক্তার বললে—নিশ্চয় হবে, কিন্তু আরো যদি কিছু করা যায়, তাই ভাবছি—

—চাকরি করতে পারবে তার বিধবা স্ত্রী?

ডাক্তার বললে—চাকরি কী করে করবে? বিধবার তো বয়েস হয়েছে—

—ছেলে-মেয়ে কেউ নেই ?

—তারা তো ছোট ছোট।

—তাহলে ?

শেষ পর্যন্ত নমিতার কথা উঠলো। বি-এ পাশ সে।

কাকিমার কথায় ফস্টার জনসন কোম্পানীর অফিসে গেল নমিতা। সারা অফিসের মধ্যে নমিতাকে যেন বড় বেমানান দেখালো। সকলেরই এক রকম শাড়ি, এক-রকম মেক-আপ। কোনও তফাৎ নেই। তারই মধ্যে নমিতার যেন কেমন লজ্জা করতে লাগলো নিজেকে দেখে।

ফ্রেনী জিজ্ঞেস করলে—তুমি কী পাশ? হোয়াট ইজ ইওর কোয়ালিফিকেশন ?

নমিতা বললে—এই বছরে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এ পাশ করেছি—

—আগে কোথাও চাকরি করেছ ?

নমিতা বললে—না—

—শর্টহ্যাণ্ড জানো ? টাইপরাইটিং ?

—জানি।

—কত টাকা মাইনে হলে তোমার চলে ?

এর কী উত্তর দেবে নমিতা !

শুধু বললে—আপনি যা দেবেন—

—আচ্ছা ডিকটেশন নাও তো—

ফ্রেনী ডিকটেশন দিলে নমিতাকে।

—তুমি ম্যারেড, না আনম্যারেড ?

ডিকটেশন নিতে গিয়ে অনেকগুলো ভুল করলো নমিতা সেন। কিন্তু ফ্রেনীর দয়ামায়া নেই। দুর্দান্ত বেগে তখন ডিকটেশন দিয়ে চলেছে। ফ্রেনীর বেবী-স্টুডিবেকারের মতই ফ্রেনীর ডিকটেশনের

স্পীড। গড়-গড় করে বলতে বলতে হঠাৎ খেয়াল হলো তার স্টেনোগ্রাফার কাঁদছে।

—হোয়াট ?

ডিকটেশন থামিয়ে ফ্রেনী হঠাৎ নমিতার দিকে চাইলে।

—আর ইউ ক্রাইং ? কাঁদছো ?

তখন মুখে আঁচল চাপা দিয়েও আর কান্না চেপে রাখতে পারছে না নমিতা।

—হোয়াট হ্যাপ্‌ণ্ড্‌ ?

মহা মুশকিলে পড়লো মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান। তারই সামনে বসে একজন ক্যাণ্ডিডেট কাঁদছে এ-রকম ঘটনা এই প্রথম। অনেক পুরুষ ফ্রেনীর সামনে বসে হাসতে চেয়েছে, কাঁদতে চেয়েছে, হাসতে-কাঁদতে পেরে ধন্য হতে চেয়েছে, কিন্তু ফ্রেনী তাদের কাউকে আমল দেয়নি। আজ এই নমিতার ব্যাপারে একটু কেমন যেন অন্য-রকম হয়ে গেল। এ অন্য-রকম হওয়া এই প্রথম।

জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে তোমার ?

নমিতা কিছুতেই উত্তর দেয় না।

—বলো, কী হয়েছে ?

—আমি আমার আণ্টকে গিয়ে কী বলবো ? আমার কাকিমার যে কষ্ট হবে শুনলে—

—কেন, কষ্ট হবে কেন ?

—খুব আশা করে আছে, আমার চাকরি হবে।

—কিন্তু চাকরি হবে না তোমাকে কে বললে ?

—আমার যে ডিকটেশন নিতে ভুল হচ্ছে ! আপনি অত জোরে বললে আমি নিতে পারবো না—

আশ্চর্য কাণ্ড !

যে-মেয়ে আজ পর্যন্ত জীবনে কাউকে দয়ামায়া করেনি, সে আজ

নমিতাকে দয়া করলে। দয়া করে চাকরি দিলে। মাসে-মাসে মাইনে দিলে দেড়শো টাকা। দেড়শো টাকার দয়া দিয়ে একেবারে কিনে নিলে নমিতাকে।

মাঝে মাঝে পৃথিবীতে যে এখনও মিরাকল ঘটে, তার আর একটা প্রমাণ পেলে ফস্টার জনসন কোম্পানীর অফিসের স্টাফেরা। বাঘ কিনা কামড়াতে ভুলে গেল ছাগলকে।

সব স্টাফেরা বলাবলি করতে লাগলো—এ-রকম হলো কী করে বলতো ভাই?

কে আর কী জানে যে বলবে।

অফিসের পর বড় সাহেব নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়েই সোজা লিফট দিয়ে নেমে নিচেয় চলে যায়। তারপর ছোটসাহেব যায়। মেজ-সাহেব, সেজ-সাহেব সবাই চলে যায়। মিস ক্রেনী তালিয়ার খান তখনও কাজ করে। নমিতাকে ডিকটেশন দিয়ে যায় অনেক রাত পর্যন্ত। লেট-আওয়ার্স না খাটলে যেন অফিসের কাজের মহা-ক্ষতি হয়ে যাবে।

যতক্ষণ অফিস খোলা থাকে ততক্ষণ, রিসেপশনিস্ট মেয়েরা থাকে। তারপর বাড়ি চলে যায়।

বাইরে রাস্তায় নেমে নমিতা সোজা হাঁটতে আরম্ভ করে। স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

হঠাৎ পেছনে হর্ন শুনেই নমিতা ফিরে দেখে মিস ক্রেনী তালিয়ার খান।

—কোথায় যাবে? কোন দিকে?

নমিতা বলে—আন্ধেরী, সাড়ে আটটায় ট্রেন—

—তোমার বাড়ি আন্ধেরীতে?

নমিতা বলে—হ্যাঁ, কাকিমারা চলে গিয়েছে, আর তো কেউ নেই, আমি একলা থাকি সেখানে—

—কেন, তারা চলে গেল কেন ?

—দেশে না গিয়ে কতদিন এখানে পড়ে থাকবে। হাতে তো টাকাকড়ি কিছু ছিল না। আমি মাইনে থেকে কিছু টাকা জমিয়ে কাকিমাকে দিলুম, তবে গাড়ি ভাড়াটা যোগাড় হলো।

—তোমার কাকা কি খুব পুওর ছিল ?

নমিতা বললে—ভেরি পুওর, তিনশো টাকা মাইনে পেত মার্চেন্ট অফিসে।

—তিনশো ওনলি ?

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান যেন আকাশ থেকে পড়লো। তিনশো টাকা পে পেয়ে মানুষ কী করে সংসার চালায়। কী করে চালাত এতদিন।

—তোমার এখন কত পে ?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত কথা বলা সম্ভব নয়।

বেবী-স্টুডিবেকারের দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—তুমি ভেতরে এসে বোস—চলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি স্টেশনে।

নমিতা গাড়িতে উঠে আড়ষ্ট হয়ে বসলো।

ফ্রেনী গাড়ি ছেড়ে দিলে। তারপর পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়ি চলতে লাগলো।

—তোমার কত পে বললে ?

—আড়াই শো।

—বাড়িটার ভাড়া দিতে হয় কত ?

—আমি বাড়িটা ছেড়ে দেব, আর একটা বাড়ি খুঁজছি। অত বড় বাড়ি আমার একলার জন্যে তো দরকার হয় না—

কিন্তু ততক্ষণে স্টেশন এসে গিয়েছে।

—ওই যাঃ, ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে যে !

—আর ট্রেন নেই ?

নমিতা বললে—না—

—চলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব,—

নমিতার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগলো। ফ্রেনী তার বস্। ফ্রেনী আড়াই হাজার টাকা পে পায়। আর সে পায় আড়াই শো। সে ঘরে সে কেমন করে নিয়ে যাবে তার বস্‌কে!

—ওঠো, গাড়িতে ওঠো, তোমাকে পৌঁছিয়ে দিই—

নমিতা তবু দ্বিধা করতে লাগলো।

—আপনি কেন আমার জন্যে কষ্ট করবেন? আর তা ছাড়া, সে পাড়াটাও ভাল নয়—

—ভালো নয় মানে?

নমিতা বললে—মানে বাড়িটার এ-পাশে ও-পাশে বস্তি—ছোট-লোকরা থাকে সেখানে—

—কিন্তু তাহলে এত জায়গা থাকতে সেখানে থাকতে গেলে কেন?

—তখন আমার মাথার ওপর অনেক বিপদ, ওই বাড়িটা পেয়ে-ছিলুম বলে তবু বেঁচে আছি, নইলে কী যে করতুম—

ততক্ষণ গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। পাশে বসে আছে নমিতা। আর মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান গাড়ি চালাচ্ছে। চলতে চলতে গাড়ি যেন উড়তে লাগলো। মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান যেন গাড়ি চালাচ্ছে না। উড়ছে। উড়ে যাচ্ছে। নমিতার ভীষণ ভয় করতে লাগলো। এত জোরে কখনও গাড়ি চালায় কেউ?

—ভয় করছে না তো তোমার, মিস সেন?

—সত্যিই মিস তালিয়ার খান, খুব ভয় করছে—

—আমি আরো জোরে চালাতে পারি। এ আমেরিকান গাড়ি কিনা, জোরে না চালালে এ গাড়ি স্টেডি থাকে না। আস্তে চালালে সমস্ত বডিটা নড়ে—পুরুষ মানুষের মত—

নমিতা চেয়ে দেখলে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের দিকে। ফ্রেনীর

মুখে যেন একটা নিষ্ঠুর আনন্দের হাসি ভেসে রয়েছে। অফিসে সামনা-সামনি অনেক দিন দেখেছে মিস ফ্রেনীকে। সে অন্য চেহারা। কিন্তু আজ গাড়ি চালাবার সময় বস্ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। সারা মুখে-গালে-গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে। গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলটা যেন পুরুষ মানুষের গলা। সেটাকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে আছে। কিছুতেই ছাড়বে না। স্টিয়ারিং হুইলটাকে যেন জব্দ না করে ছাড়বে না মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান। নমিতা সেন সেই দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। ফ্রেনীর বুকের ঢেউটার সঙ্গে স্টিয়ারিং হুইলটার ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে। দু'জনে যেন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে নিথর হয়ে রয়েছে।

—এইখানে রাখুন!

—এখানে? এত কাছে?

—হ্যাঁ, এই তো আন্ধেরী, এইখানেই তো আমার বাড়ি—

যেন অনিচ্ছার সঙ্গে ফ্রেনী গাড়িটা থামালে। স্টিয়ারিং-হুইলটা ছাড়তে যেন তখন কষ্ট হচ্ছিল তার।

—আপনি খুব জোরে গাড়ি চালান তো?

ফ্রেনী বললে—আমার জোরে গাড়ি চালালেই ভাল লাগে।

—কিন্তু এতে জোরে গাড়ি চালানো কী সেফ?

ফ্রেনী বললে—লাইফ ইজ আনসেফ।

বলে হাসতে লাগল। তারপর কৌটো থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালো। এতক্ষণ পরে যেন সমস্ত শরীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে এসেছে ফ্রেনীর।

—আচ্ছা, আসি তাহলে, গুড্ নাইট মিস—গুড নাইট।

নমিতা নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে দরজার চাবি খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকলো—

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—এও আপনাদের এক রকম ক্যারেকটার, এই মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান। যে-মেয়ে দুশোটা নমিতা সেনকে কিনে আবার ডবল-প্রাইসে বেচে দিতে পারে, যে-মেয়ে অনেক মেয়ের দণ্ড-মুণ্ডের গৃহিণী, সেই মেয়ে যে কেন এত লোক থাকতে নমিতা সেনকে বেছে তার নিজের স্টেনোগ্রাফার করে নিলে তা আজও রহস্য হয়ে রয়েছে।

অথচ প্রথম যেদিন টেস্ট নিলে নমিতার, সেদিন তো একান্নটা ভুল বেরিয়েছিল তার টাইপিং-এ।

ফ্রেনী বলেছিল—এখানে তোমার সার্ভিস হওয়া ডিফিকালট—

নমিতা তখন প্রায় হতাশায় ভেঙে পড়ে পড়ে।

বলেছিল—অলরাইট মিস—

—তুমি কী করবে?

নমিতা বলেছিল—আমার তো হ্যাবিট নেই, একটু প্র্যাকটিস করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে যদি আর একটা চান্স দেন তো আমি খুব গ্ল্যাড হবো—

—কিন্তু এ-ক'দিন চালাবে কী করে? তোমার টাকা আছে?

—না!

তারপর মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান যা কখনও করে না তাই করেছিল। নিজের ব্যাগ থেকে পাঁচশো ক্যাশ টাকা বার করে নমিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বলেছিল—কীপ ইট—

কাকিমা সমস্ত শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। বলেছিল—ওমা, বলিস কী রে, তোকে ওমনি পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলে?

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করেছিল—তা কেন দিলে রে? তুই টাকা চেয়েছিলি বুঝি?

—না কাকিমা, টাকা আমি কেন চাইবো? কাকার মারা যাওয়ার খবরটা শুনেছে, তাই দয়া হয়েছে।

—আহা, কত ভালো লোক আছে পৃথিবীতে। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো, মেয়েমানুষের দুঃখ মেয়েমানুষ ছাড়া আর কে বুঝবে। আহা মা, বেঁচে বর্তে থাক, তার ভালো হোক!

কাকিমারা সে-কালের লোক। মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের ভালোই চেয়েছিল মনে মনে। হলেই বা অনেক টাকার মালিক, হলোই বা আড়াই হাজার টাকা মাইনেওয়ালা অফিসার! গরীব লোকের দুঃখটা কি কম বোঝে? এই বোম্বাই শহরে বড়লোকের তো অভাব নেই। কে এই গরীব মেয়েটাকে অমন এক কথায় পাঁচশো টাকা দিতে পারতো? ক'টা লোকের অমন দিল আছে বলুন?

তা সে-সব অনেকদিনের কথা। সে-কাকিমাও দেশে চলে গেছে, সেই খুড়তুতো বোনেরাও এখন বিয়ে-থা হয়ে গিয়ে সুখে সচ্ছন্দে ঘর-সংসার করছে।

সেদিন সেই পাঁচশো টাকা দিয়ে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান যে-উপকার করেছিল নমিতার তা ভোলবার নয়। তার একমাস পরেই আবার একদিন আর একটা চান্স দিয়েছিল নমিতাকে। আবার ডিকটেশন দিয়েছিল।

সেবার অত ভুল হয়নি। তিনটে ভুল এমন কিছুই নয়।

তেমন ভুল সকলেরই হয়ে থাকে।

সেই থেকে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করতে করতে আজ দু'বছর হয়ে গেল নমিতার এই বোম্বাই-শহরে। এই মিস্ ফ্রেনীর কাছে। একদিন সংসারের সাশ্রয় করবার জন্যে তাকে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল। আজ হয়ে গেছে প্রয়োজনের জিনিস। আজ আর ইচ্ছে করলেও এ-চাকরি ছাড়তে পারবে না নমিতা। সারাদিন অফিসে শর্টহ্যাণ্ড ডিকটেশন নিয়ে যখন ট্রেনে ওঠে, তখনই যত রাজ্যের

ক্লান্তি এসে তাকে ঘিরে ফেলে। ট্রেনটা আন্ধেরী পৌঁছতে সময় লাগে আধঘণ্টা। তারপর বাড়িতে এসে স্নান করে তৈরি হতে হতে সাতটা আটটা বেজে যায়।

সেই সময়েই আসে....

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান জানতো না। বলতে গেলে তারা ত্ব'জন ছাড়া আর কেউ জানতো না। তবু একদিন জেনে গেল।

—কে জেনে গেল ?

—মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান। এই গল্পের প্রধান ক্যারেকটার।

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—সেদিন মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান নমিতাকে নামিয়ে দেবার পর অনেক দূর চলে গেছে গাড়ি চালিয়ে, মানে আন্ধেরী থেকে প্রায় কাম্বালা হিলের কাছাকাছি। হঠাৎ ফ্রেনীর নজর পড়লো নমিতার ব্যাগটার দিকে। নমিতা হ্যাণ্ড-ব্যাগটা ফেলে গেলা গাড়িতে।

ফ্রেনী একবার ব্যাগটায় হাত দিয়ে দেখলে। তারপর ভাবলে সেটা খুলে ভেতরটা দেখবে। কিন্তু কেমন মনে হলো। পরের ব্যাগ খোলা উচিত নয়।

হয়ত দরকারী কিছু আছে ভেতরে। হয়ত মান্থলি টিকেট আছে ট্রেনের। কালকে অফিসে আসবার সময় হয়ত অস্থবিধে হবে।

মনে হতেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলে।

ঘুরিয়ে নিয়ে আবার আন্ধেরী চললো। আবার পঞ্চাশ মাইল স্পীড। আবার ঘণ্টা ত্বয়েক সময়। আর বাড়িতে ফিরে গিয়েই বা কী করার আছে। সেই তো বাড়িতে গিয়েই হট-ওয়াটার বাথ একঘণ্টা ধরে। তারপর আর কোনো কাজ নেই। তখন আর সময় কাটতেই চায় না।

আবার আন্ধেরীর কাছে এসে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে দিলে।

কোনও উত্তর নেই।

আন্ধেরীর এ-জায়গাটায় কখনও আগে আসেনি ফ্রেনী। তা ছাড়া অন্ধকার বেশ চারদিকে। আশেপাশে দু-একটা দোকান। টিম টিম করে কেরাসিনের আলো জলছে।

কাকেই বা জিজ্ঞেস করা যায় ?

গাড়িটা রাস্তার একপাশে রেখে ফ্রেনী নামলো রাস্তায়। সোনালী রংএর জুতোয় একটু কাদা লেগে গেল বোধহয়। শায়াটা ঝুলছিল, সেটাও দাগী হয়ে গেল। সিল্কের শাড়ির আঁচলটা হঠাৎ কাঁধ থেকে খসে পড়ে গেল মাটিতে।

রট্‌!

ফ্রেনীর রাগ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। এমন করে এই অবস্থায় জীবনে যায়নি কখনও কোথাও। ছোটবেলা থেকে গাড়ি চড়ে আসছে, ছোটবেলা থেকে কার্পেটের ওপর হাঁটা অভ্যেস করেছে। আজ সেই তাকেই এমন ভাবে এখানে তারই অফিসের স্টেনোর বাড়িতে আসতে হবে, তা কল্পনা করতেও পারে নি আগে।

অথচ বাড়িতে পৌঁছে ড্রাইভারকে কিম্বা চাকরকে দিয়েই ব্যাগটা পাঠিয়ে দিলে হতো।

গা ঘিন ঘিন করতে লাগলো ফ্রেনীর।

সামনের অন্ধকারে কে যেন কাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছিল।

ফ্রেনী তাকেই জিজ্ঞেস করলে—এখানে মিস সেন কোন ফ্ল্যাটে থাকে ?

লোকটা আনাড়ি। বুঝতে পারলে না কিছু। অফিসে হলে লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে ডিসচার্জ করে দিত ফ্রেনী। এ-রকম বেয়াদপি সহ্য করতো না ফস্টার জনসন।

—ইধার কোই নেই হ্যায় ? কোই জেনানা ? দফতর মে কাম করতি হ্যায় ?

এতক্ষণে বোধহয় বুঝতে পারলে লোকটা। এতক্ষণে ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দিলে।

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান কোথা দিয়ে ভেতরে যাবে, কোথায় দরজা কিছুই বুঝতে পারেনি।

ঘিঞ্জি বাড়ি। পাশাপাশি ফ্ল্যাট। একেবারে লোয়ার মিডল-ক্লাস চেহারা। চ্যাঁ-ভ্যাঁ করছে মেয়েরা ছেলেরা।

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানকে দেখে বোধহয় সন্দেহ হয়েছে তাদের, এ খুব বড়লোক। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে এল। এই অন্ধকার বস্তীর মধ্যে যে এতগুলো লোক একসঙ্গে থাকে সেটাও ফ্রেনী কল্পনা করতে পারেনি।

একবার মনেও হলো, ফিরে গেলেই ভালো হতো। বাড়ি ফিরে গিয়ে ড্রাইভার কিম্বা চাকরকে দিয়ে ব্যাগটা ফেরত পাঠালেই ভালো হতো।

—কাকে চান আপনি ?

—মিস সেন।

—ওই দিকে যান। পেছন দিকের গ্রাউণ্ডফ্লোর।

আর বলতে হলো না। একেবারে সরু গলি দিয়ে পেছন দিকে যাবার রাস্তা। সেটাও অন্ধকার। অন্ধকার হাতড়ে তখন ফ্ল্যাটটার ঠিক সামনে গেছে ফ্রেনী, গিয়ে সামনেই একটা দরজা। দরজাটায় একটু ফাঁক ছিল। ভেতরে আলো জ্বলছে। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা গেল মিস সেন কার সঙ্গে যেন গল্প করছে। ময়লা একটা শাড়ি পরেছে। কার সঙ্গে গল্প করছে ? তবে যে মিস সেন বলেছিল তার বাড়িতে কেউ নেই। এ তবে কে ? কার সঙ্গে গল্প করছে ?

—মিস সেন ?

বাইরে থেকে দেখা গেল, মিস সেন যেন চমকে উঠলো ফ্রেনীর গলার শব্দ শুনে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

—ও, আপনি ?

দরজাটা খুলতেই ফ্রেনী দেখলে আর এক জন বসে আছে সামনে। এতক্ষণ দেখা যায়নি। একজন ইয়াংম্যান। দু'জনে মুখোমুখি বসে গল্প করছিল। এই অবস্থায় যেন তাকে আশা করেনি।

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানেরও মনে হলো এই অবস্থায় এখানে এসে যেন ভাল করেনি সে। ইয়াংম্যানটা তাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে। কী ময়লা সস্তার ট্রাউজার পরেছে। একটা টুইলের শার্ট গায়ে। রোগা-রোগা। সমস্ত চেহারার মধ্যে প্রোটিনের অভাব নজরে পড়ছে।

আর মিস সেনকেও যেন বড় আগ্‌লি লাগলো। অফিসে তবু খানিকটা সেজেগুজে যায়। হয়ত একটু পাউডারও মাখে মুখে। এখানে এই বাড়ির ভেতরে হয়ত এমন করে ময়লা শাড়ি পরে থাকতে লজ্জা হয় না। আর মিস সেন হয়ত ভাবতেও পারেনি এমন করে ফ্রেনী তাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলবে।

—আপনি যে হঠাৎ ?

—তোমার হ্যাণ্ডব্যাগটা গাড়িতে ফেলে এসেছিলে।

মিস সেন আরো লজ্জায় পড়ে গেল যেন। বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

বললে—ছি ছি, তা বলে আপনি কেন নিয়ে এলেন ?

বলে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিয়ে নিলে ফ্রেনীর কাছ থেকে।

—আসুন, ভেতরে আসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

ভেতরে ঢুকতো না ফ্রেনী। এ-রকম পরিবেশে, এই লোয়ার-মিডল ক্লাস বাঙালী মেয়ের ফ্ল্যাটের ভেতর কখনও ঢোকেও নি সে আগে। কিন্তু ওই ইয়াংম্যানটাকে দেখে কেমন যেন কৌতূহল হলো। মিস সেনের লাভার নাকি ? মিস সেনের মত গরীব মেয়েরও লাভার থাকে ?

—বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে তোমার ব্যাগটাকে নজরে পড়লো।

ভাবলাম, ওর ভেতরে তোমার রেলওয়ের মান্থলি-টিকেট আছে হয়ত, আই ডোণ্ট নো—

—তা থাক, কিন্তু আপনি আমার জন্যে কেন এত কষ্ট করতে গেলেন?

তারপর বোধহয় ফ্রেনীর পায়ের দিকে নজর পড়লো।

মিস সেন বললে—আমার নিজেরই বড় লজ্জা করছে, আপনার জুতো নষ্ট হয়ে গেল, আপনার শায়াতেও কাদা লেগেছে, শাড়িটাও খারাপ হয়ে গেল—

—তা যাক, আমি এখন চলি। লেট মি গো নাউ—

—একটু বসবেন না?

তারপর নিজের অবস্থার কথাটা ভেবেই বললে—আর আপনাকে বসতে দেবই বা কোথায়? আপনি এসেছেন, আমার বসতে দেবারই জায়গা নেই।

—তাতে কী হয়েছে, আমি তো বসতে আসিনি।

ইয়াংম্যানটা এতক্ষণ শুধু দাঁড়িয়ে শুনছিল। এবার সরে দাঁড়ালো।

বললে—আপনি এখানে বসুন না—

মিস সেন তাড়াতাড়ি ইনট্রোডিউস করে দিল।

—ইনি আমার বন্ধু, মিস্টার....

ফ্রেনী চেয়ে দেখলে ভালো করে ইয়াংম্যানটার দিকে। মিস সেন কি বেছে বেছে একেই লাভার করেছে? এই ক্যাডাভ্যারাস ছেলেটাকে?

ফ্রেনীর চলে যেতেই ইচ্ছে হচ্ছিল এই জায়গাটা ছেড়ে। কিন্তু নিজের অজান্তেই বসে পড়লো চেয়ারটার ওপর!

বললে—তুমি বসবে না?

এতক্ষণে যেন ফ্রেনীর নজরে পড়েছে ঘরে একখানা চেয়ার মাত্র। আর কোন বসবার জায়গা নেই। আর একটা কট। খাট। তক্তপোষ। সস্তার—চীপ তক্তপোষ। তারই ওপর বিছানা। ওই বিছানাতেই মিস সেন রাত্রে শোয়। আর এই সংসার। চারিদিকে

আর ফার্নিচার নেই একটা। এমনকি ব্লাউজ শাড়ি রাখবার ওয়াড্রোবও নেই। না আছে সোফা, না আছে একটা ড্রেসিং-টেবল। কোথায় বসে মিস সেন টয়লেট করে কে জানে। দেয়ালের গায়ে পেরেকে একটা ছোট আয়না ঝুলছে।

—আপনি এলেন আমার বাড়িতে, চা করে দেব আপনাকে ?

—না, তার দরকার নেই, তার চেয়ে আমি উঠছি।

ছেলেটি বলল—মিস সেনের কাছে আপনার নাম শুনেছি এতদিন, এবার আপনাকে চোখে দেখলুম।

মিস সেন কথার মাঝখানে বললে—এ আন্ধেরীতে না থাকলে আমি এখানে একলা থাকতেই পারতুম না। এখানকার এ্যাসোসিয়েশন দেখলেন তো ? চারপাশে সব লো-ক্লাশ লোক থাকে।

ছেলেটা বললে—এ ছাড়া বাড়িও তো পাওয়া যায় না। মিস সেনের থাকবার মত বাড়িই বা কোথায় পাচ্ছি বলুন, আমি তো অনেক চেষ্টা করছি।

মিস সেন বললে—আজকাল ফ্ল্যাট-ভাড়াও বেড়ে গেছে খুব, একশো টাকায় আর ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না বোম্বেতে। আপনি ভাল করে বসুন না, আপনাকে খুব কষ্ট দিলুম।

ছেলেটি বললে—তুমি একটু চা করে দাও নমিতা, মিস তালিয়ার খান এত কষ্ট করে এলেন।

সেই ময়লা আবহাওয়া, সেই নোংরা ঘর, সেই ডার্টি ছেলেটা, সমস্ত কিছু যেন বিশ্রী লাগছিল ফ্রেনীর। হঠাৎ বললে—যাই আমি, তোমারও কাজ আছে নিশ্চয়ই—

মিস সেন বললে— না, না, আমার কিছু কাজ নেই, আমি তো অফিস যাবার আগে দুবেলার রান্না করে রেখেছি—এখন ওর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছিলুম।

—তা হোক, তুমি গল্প করো, আমি উঠি।

বলে এবার সত্যি-সত্যিই উঠলো ফ্রেনী। তারপর দরজার দিকে এগোতে লাগলো। মিস সেনও পেছন পেছন এলো।

বললে—রাস্তাটা অন্ধকার, একটু দেখে সাবধানে যাবেন!

কিন্তু মিস সেন সাবধান করে দেবার আগেই ফ্রেনী অন্ধকার গলিটার ওপর নেমে পড়েছে। মিস সেনও পেছন পেছন আসতে লাগলো।

—দেখবেন, আমার হাতটা ধরুন।

বলে মিস সেন এগিয়ে গিয়ে ফ্রেনীর হাতটা ধরলো। হাতটা খুব শক্ত। বেশ কড়া। হয়ত মিস সেন নিজের হাতে সব কাজ করে বলে হাতের পাতায় এত কড়া পড়িয়ে ফেলেছে। ফ্রেনী বেশ ভাল করে হাতটা ধরলো।

—এখানটা একটা গর্ত আছে, দেখবেন।

তারপরে হাত ধরে একেবারে সোজা রাস্তায় নিয়ে গেল। এবার আর জুতোতে, শায়াতে, শাড়িতে কাদা লাগলো না।

মিস সেনই শুধু এগিয়ে দিতে এসেছিল। সেই ছেলেটা আসেনি। হঠাৎ ফ্রেনী জিজ্ঞেস করলে—ও কি তোমার ওল্ড ফ্রেণ্ড?

মিস সেন—না—

—নিউ?

মিস সেন বললে—হ্যাঁ, নিউ—

—অলরাইট!

আর কিছু বললে না ফ্রেনী। গাড়ি স্টার্ট দিলে। তারপর কাট-আউট খুলে দিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে ফ্রেনীর বেবী-স্টুডিবেকারটা আন্ধেরী ছাড়িয়ে সোজা কাম্বালা হিলের দিকে চললো।

মিস্টার সেনগুপ্তর সঙ্গে আমার নতুন পরিচয় হয়েছিল। আমাদের পাড়ার সবাই-ই নতুন লোক। সবাই এসে যে-যার ক্ষমতা মত বাড়ি

করেছি। কারো ছোট বাড়ি। কারো বড় বাড়ি। কেউ নিজে দাঁড়িয়ে বাড়ি করেছে, কেউ কনট্রাকটারকে দিয়ে। কারো ফ্যাশনেবল বাড়ি, কারো সাদাসিধে।

কিন্তু পাড়ার মধ্যে মিস্টার সেনগুপ্তর বাড়িটাই ছিল সব চেয়ে ফ্যাশনেবল।

অনেকটা চণ্ডীগড়ের বাড়িগুলোর মত।

কোন এক ইটালীয়ান আর্টিস্ট এসেছিল বোম্বেতে। কোন স্টেট-গভর্নমেণ্টের একটা স্পেশাল কাজে। মিস্টার সেনগুপ্ত সেই ইটালিয়ান আর্টিস্টকে ডেকে আনিয়েছিলেন কলকাতায়। তাকে দিয়ে বাড়ির প্ল্যান করিয়ে নিয়েছিলেন। দূর থেকে আর কাছে থেকেও দেখে বোঝা যেত বাড়িটা দামী। মানে বেশ দামী। অর্থাৎ দেড় লাখ টাকার কমে অমন বাড়ি হয় না। কেউ কেউ ত্‌'লাখও বলতো। আবার কেউ বলতো ত্‌'লাখ নয়, এক লাখ।

আমি ভাবতাম তা এক লাখই কি কম নাকি?

কিন্তু মিস্টার সেনগুপ্ত যেদিন প্রথম বাড়ি করলেন, সেই দিন থেকেই নানারকম গুজব রটতে লাগলো। কেউ বললে—লটারির টাকা। লটারিতে নাকি অনেক টাকা পেয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার সেনগুপ্ত।

আর কেউ বললে—শ্বশুরের টাকা।

কিন্তু কোনটারই কেউ কিছু প্রমাণ দিতে পারলে না। সবই অনুমান। অনুমানের ওপরেই সকলে নানা রকম গুজব ছড়িয়েছিল।

তারপর বহুদিন বাস করার পর সে-গুজব নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় নি। সে-গুজব ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল।

তাই যখন আমার সঙ্গে মিস্টার আর মিসেস সেনগুপ্তের আলাপ হলো, তখন মনে পড়তে লাগলো সেই সব গুজবের কথা।

কিন্তু একদিনও সে-সব কথা আমি তুলিনি।

আমি দেখতাম মিস্টার সেনগুপ্ত সকাল আটটার সময় গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যেতেন। আর একখানা গাড়ি ছিল মিসেস সেনগুপ্তের। তিনি সেখানা নিয়ে বেরোতেন পরে। মিস্টার সেনগুপ্ত নিজের অফিসে যেতেন। কিন্তু মিসেস সেনগুপ্ত কোথায় যেতেন তা কেউ জানতো না। আসলে কোথাও না। হয়ত বেড়াতেই যেতেন। গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে, টাকা আছে, অবসর আছে, সবই আছে। সুতরাং তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

কিন্তু অবাক হবার একটা জিনিষ ছিল এই যে এত টাকা কোথা থেকে পেয়েছেন মিস্টার সেনগুপ্ত? অন্তত একপুরুষে এত টাকা একজনের পক্ষে আয় করা সম্ভব নয়। মিস্টার সেনগুপ্তর যা কাজ, তাতে অন্তত তা সম্ভব নয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

—তারপর?

মিস্টার সেনগুপ্ত আবার আরম্ভ করলেন—তার পরদিনই দেখা হলো অফিসে। মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান ডেকে পাঠালো স্টেনোগ্রাফারকে—

অফিসে গিয়ে স্টেনোকে ডেকে পাঠানো নতুন নয়। এটাই ফ্রেনীর নিয়ম। সকালের দিকে অফিসে গিয়ে ফ্রেনী গাদাখানেক চিঠিই প্রত্যেক দিন ডিকটেশন দেয়।

তারপর লাঞ্চ আওয়ার।

লাঞ্চের সময় একঘন্টা রেস্ট। কিন্তু এক-একদিন বিশ্রাম নেওয়ারও সময় থাকে না মিস সেনের। অনেক ডিকটেশন টাইপ করে আবার সজিয়ে-গুজিয়ে পিন এঁটে পাঠিয়ে দিতে হয় বস-এর টেবিলে।

সেদিন মিস সেন ঘর থেকে চলে আসছিল কাজ সেরে। হঠাৎ ফ্রেনী ডাকলে।

—শোন।

মিস সেন ফিরে দাঁড়াল। ফ্রেনী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো—কাল কত রাত্তিরে তোমার ফ্রেণ্ড গেল?

প্রথমটায় প্রশ্নটা শুনে নমিতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললে—আপনি চলে যাবার পরই চলে গেল।

—ও কি তোমার খুব পুরনো ফ্রেণ্ড?

—না, সবে ছ-মাস হলো আলাপ হয়েছে।

—ও—অলরাইট!

যেন নতুন ফ্রেণ্ডশিপ শুনে ফ্রেনী একটু চিন্তিত হলো।

মিস সেন ভাবলে, ফ্রেনীর হয়ত আর কিছু কথা জিজ্ঞেস করবার নেই। চলেই আসছিল।

কিন্তু ফ্রেনী আবার জিজ্ঞেস করলে—তোমরা বুঝি ডেইলী মিট করো?

মিস সেন বললে—ও রোজ আসে।

—ভ্যাটস অলরাইট—

বলে আবার নিজের কাজে মন দিলে ফ্রেনী।

মিস সেন ভেবেছিল ও-প্রসঙ্গ বোধহয় আর তুলবে না ফ্রেনী। সত্যি তার নিজেরই লজ্জা করেছিল খুব। অমন করে সুশান্তকে দেখে ফেললে। আগে জানলে ঘরটা অন্তত গুছিয়ে রাখতো। ময়লা শাড়িগুলো আড়ালে লুকিয়ে ফেলতো। বালিশের ওয়াড়গুলোও ময়লা ছিল।

ফ্রেনী চলে যাবার পর সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল—এই তোমাদের বস?

নমিতা বলেছিল—আমি ভাবতেই পারিনি যে এমন করে আমার ঘরে চলে আসবে।

—ভালোই তো হলো।

—কিন্তু চারদিকে এমন নোংরা, আমার ভারি লজ্জা করছিল, সত্যি।

—তা তোমার অবস্থা তো তোমার বস-এর জানতে বাকি নেই। আড়াই শো টাকা মাইনেতে এর চেয়ে ভালো ফ্ল্যাট,কী করে পাওয়া যাবে?

নমিতা বলেছিল—কিন্তু মানুষটা খুব ভালো—জানো—

—অত টাকা, ভাল হবে না কেন মানুষটা?

—তা টাকা বেশি হলেই তো মানুষ খারাপ হয়ে যায়।

সুশান্ত বলেছিল—আমার টাকা থাকলে আমাকেও তুমি ভাল বলতে—

হেসে ফেলেছিল নমিতা—এমনিতেই তো তোমাকে ভাল বলি।

—না, সে-কথা বলছি না। আজ যদি আমার টাকা থাকতো অনেক, তো তুমি এখন আজই আমাকে বিয়ে করে ফেলতে।

কথাটা বলে সুশান্তও হেসে উঠেছিল হো-হো করে, নমিতাও হেসে উঠেছিল।

অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছিল। সবাই চলে গেছে তখন। মিস সেনও যাবার উদ্যোগ করছিল।

ওদিকে সুশান্ত কালকের মতই এসে বসে থাকবে।

চাপরাশিকে ডেকে মিস সেন জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, মিস আছেন এখনও?

চাপরাশিটাও বোধহয় মিস-এর খবর দিতে আসছিল।

বললে—আপনাকে একটু থাকতে বলে দিয়েছেন ফ্রেনী মেমসাব

ফ্রেনী মেমসাহেব কেন কিসের জন্যে থাকতে বলেছেন তা সে জানে না। হয়ত কোন আর্জেন্ট কাজ আছে। আবার কালকের মত রাত হয়ে যাবে। আবার ট্রেন মিস করবে।

এক-ঘণ্টা কেটে গেল। পাঁচটার সময় অফিসের ছুটি। ছ'টা বেজে গেল। সাতটা বেজে গেল।

তবু ডাক পড়ে না ফ্রেনী মেমসাহেবের ঘর থেকে।

শেষ পর্য্যন্ত মিস সেন বস-এর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

—আমাকে কি আপনি ওয়েট করতে বলেছেন?

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান কাজ করতে করতে মুখ তুললে।

বললে, হ্যাঁ, এই পেপার ক'টা টাইপ করে দাও মিস সেন। এটা কালকে আর্লি আওয়ার্সে ডেসপ্যাচ করতে হবে।

—আজকেই টাইপ করতে হবে?

—হ্যাঁ, প্লিজ।

বলে একটু হাসলো মিস খান।

অর্থাৎ বাড়তি কাজ। বাড়তি কাজ করাচ্ছে বলে একটু হাসি দিয়ে কৃতার্থ করতে চাইল মিস সেনকে।

তারপর যখন রাত ন'টা, তখন সমস্ত ফস্টার জনসন কোম্পানীর অফিস নিঃঝুম হয়ে এসেছে। কেউ কোথাও নেই। শুধু একটা চাপরাশি আর দু-জন মহিলা বসে বসে ফাইল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

রাত সাড়ে-ন'টার সময় ফ্রেনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকলো মিস সেনের ঘরে।

—হয়ে গেছে?

কাগজগুলো নিজের ঘরের টেবিলের ওপর রাখতে বলে দিয়ে এক সঙ্গেই বেরোল। লিফ্‌ট দিয়ে নামতে নামতে ভাবছিল, এতক্ষণ নিশ্চয়ই সুশান্ত এসেছে। তার কাছে চাবি থাকে ডুপ্লিকেট।

বসে বসে এতক্ষণ হয়ত বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। কিম্বা ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিচের রাস্তায় নেমে ফ্রেনী জিজ্ঞেস করলে—এখন তো আর তোমার ট্রেন নেই?

মিস সেন বললে—না, মিস।

—তাহলে কী করবে?

—বাসে করে যাবো।

—তাতেও তো অনেক টাইম লাগবে?

—হ্যাঁ। কিন্তু তা আর কী করা যাবে?

বলে তাড়াতাড়ি বাস-রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল মিস সেন।

পেছন থেকে ফ্রেনী বললে—তার চেয়ে এক কাজ করো না—

—কী?

পেছন ফিরলো নমিতা।

—এখন অত দূরে গিয়ে কী করবে?

মিস সেন বললে—কিন্তু বাড়িতে তো যেতেই হবে।

—যদি না যাও?

কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল মিস সেন।

ফ্রেনী বুঝিয়ে বললে—আজ বাড়ি না গেলে কি তোমার খুব অসুবিধে হবে? দরজায় তালা দেওয়া আছে তো?

—তা দেওয়া আছে।

—চুরি হবার ভয় নেই তো?

—না, তা ভাবছি না।

—তবে? কী ভাবছো?

কী যে ভাবছে নমিতা, তা খুলে স্পষ্ট করে বলতে পারেনা মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানকে। আর তা ছাড়া বাড়িতে না গিয়ে অন্য কোথাও রাত কাটালে যে তার ঘুম হবে না, তা-ও খুলে বলা যায় না।

—তার চেয়ে আজ রাত্তিরটা আমার বাড়িতে চলো না?

—আপনার বাড়িতে?

—কেন? আপত্তি কী?

তবু নমিতা একটু দ্বিধা করছিল।

ফ্রেনী বললে—তোমার শাড়ি-ব্লাউজের জন্যে ভাবনা নেই। আমার অনেক শাড়ি আছে, তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

তবু নমিতা কী করবে বুঝতে পারছিল না। সুশান্ত কী ভাবছে, কে জানে। সুশান্ত হয়ত রাগ করে কথাই বলবে না কাল। যা অভিমানী ছেলে!

—চলো, দেরি করে লাভ নেই। ইটস গেটিং লেট—

আর তারপর সেই প্রথম নমিতার জীবনে আর এক প্রকাণ্ড অভিজ্ঞতা হলো। এতদিন যে পৃথিবীকে জেনে এসেছিল, এ যেন সে-পৃথিবী নয়। এ আলাদা। এখানে টাকা টাকা নয়, যৌবন যৌবন নয়, হয়ত জীবনও জীবন নয়।

সেদিন রাত্রে এক নতুন ক্যারেকটারের সঙ্গে পরিচয় হলো নমিতাব। সেই প্রথম, আর সে-ই শেষ।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম?

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—সেইজন্যেই তো আপনাকে গোড়াতেই বলেছিলাম, ক্যারেকটার নিয়ে আপনি লিখবেন কি না? সত্যিই এ-এক অদ্ভুত ক্যারেকটার। এই মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান।

দেখুন, কোনও ক্যারেকটারকে বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যায় না। ক্যারেকটার বুঝতে হলে সিচুয়েশান দিয়ে এক্সপ্লেন করতে হয়। এই মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানকে যারা বাড়িতে দেখেছে, যারা রাস্তায় তাকে বেবী-স্টুডিবেকার চালাতে দেখেছে, যারা তার অফিসের চেম্বারে দেখেছে, তাদের দেখা আর নমিতার দেখা অন্য রকম। একই মানুষকে পার্লারে দেখা আর ড্রয়িংরুমে দেখা আর বেড-রুমে দেখা এক জিনিষ নয়। সেই জন্যেই তো আমরা কাউকে সহজে বেড-রুমে ঢুকতে দিলে ধরা পড়ে যাই। লোকে আমাদের চিনে ফেলে।

কিন্তু যদি আমরা ধরা দিতেই চাই? যদি আমরা চাই যে কেউ আমাদের চিনে ফেলুক?

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানেরও তাই হলো। সেই রাত্রে কেন যে মিস সেনকে তার নিজের ঘরে শুতে বললে কে জানে! মালটি-মিলিয়ন টাকার মালিক মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান সেদিন প্রথম মিস সেনের সামনে সব ছদ্মবেশ একেবারে খুলে ফেললে।

—আমার জন্যে আপনার অনেক অসুবিধে হলো।

—না, তুমি কিছু ভেবো না মিস সেন। আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

—আপনার বিছানায় কেন শুতে দিলেন? আমি তো অন্য কোথাও শুতে পারতাম। আমার সব জায়গাতেই ঘুম হয়।

বিরাট বেডরুম। চারদিকে আয়না। চারদিকে ওয়ার্ড্রোব। চারদিকে আরাম। চারদিকে ঐশ্বর্য। জীবনে এমন আরামের মধ্যে কখনও বাস করেনি আগে মিস সেন। এমন আরাম এমন ঐশ্বর্য কখনও দেখেই নি জীবনে। টাকা খরচ করলে মানুষ এমন আরামও পায়!

ফ্রেনী তার নিজের শাড়ি দিয়েছে। নিজের ব্লাউজ, নিজের পেটিকোট, নিজের সব কিছু দিয়েছে। নিজের সাবান, নিজের টাওয়েল, নিজের বালিশ, নিজের ঘর, নিজের সব কিছু দিয়ে মিস সেনকে খুশী করবার চেষ্টা করেছে। এর চেয়ে একজন সাধারণ লেডী-স্টেনো আর কী আশা করতে পারে?

নীল আলোটা জ্বেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই মিস ফ্রেনী শাড়ি বদলেছে, শায়া বদলেছে। মিস সেন ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে রয়েছে জেনেও এতটুকু লজ্জা-সঙ্কোচ কিছু নেই। কী স্বাস্থ্য মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের! অফিসে বাইরে থেকে দেখে ঠিক বোঝা যায় না। পোষাকের তলায় যে তার এত উচ্ছলতা, মিস সেন তা কোনও দিন কল্পনা করতে পারতো না।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নমিতার।

—কে? কে?

হয়ত স্বপ্ন। কিম্বা হয়ত স্বপ্ন নয়। কিম্বা সাধারণ একটা ঘটনা দুর্ঘটনাও হতে পারে। ডানলোপিলোর দোলানি। স্প্রিং-এর ঢেউ। তারপর আবার ঘুম। আবার ভোর। আবার সকাল। আবার শাড়ি বদলানো। আবার বেবী-স্টুডিবেকার। আবার ফস্টার জনসন কোম্পানীর অফিস। আবার স্টেনোগ্রাফি।

অফিসময় রটে গেল মিস সেনের প্রমোশনের কথা।

একটাকা, দু টাকা নয়, একেবারে আড়াই শো টাকা।

তার মানে, সমস্ত জড়িয়ে পাঁচ শো টাকা।

এই সেদিন যে এসেছিল এ-অফিসে পপার হয়ে সে, আজ লক্ষ্মীর কৃপা পেয়েছে। যারা একদিন একসঙ্গে পাশে বসে গল্প করেছে, একসঙ্গে একটা চা শেয়ার করে খেয়েছে, সে হঠাৎ তাদের টপকে একেবারে নাগালের বাইরে চলে গেছে।

আর স্টেনোগ্রাফি নয়। একেবারে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের পার্সোন্যাল সেক্রেটারি। পার্সোন্যাল সেক্রেটারির মতই ড্রেস। মিস সেনের টেবলেও ফ্রেনীর টেবলের মত টেলিফোন। মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আগে মিস সেনের পারমিশন চাই।

সমস্ত যেন বদলে গেল রাতারাতি।

অফিস-জীবনে উত্থান-পতন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এমন হামেশা হয়ে থাকে। তা নিয়ে লোকে আনন্দ পায়, কষ্টও পায়। সময়ে সময়ে অবাকও হয়। কিন্তু এমন করে বিপর্যয় সৃষ্টি করে না কোথাও। ফস্টার জনসন কোম্পানীর অফিসে যেন মানসিক বিপর্যয় ঘটে গেল।

দু'জনে একসঙ্গে অফিসে এসে যে-যার নিজের ঘরে গিয়ে বসে। তারপর আবার অফিসের শেষে একসঙ্গে বাড়ি চলে যায়।

লোকের প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি।

তারা বলে—তাই নাকি ?

উত্তর আসে—হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ—

—কিন্তু তা কী করে হয় ?

—হয় হয়, সবই হয়। ভালো করে তেল মাখাতে পারলে সবই হয়—

প্রথমটা গুঞ্জন, তারপরে রটনা, শেষকালে জিনিষটা সহজ হয়ে গেল সকলের চোখে। তখন আর ও নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাতো না। মিস ফ্রেনীর যেরকম শাড়ি, মিস সেনেরও সেই রকম শাড়ি। মিস ফ্রেনীর যেমন গাড়ি, মিস সেনেরও তেমনি গাড়ি। এ কথা আব কারো জানতে বাকি নেই, মিস সেন মিস ফ্রেনীর বাড়িতেই থাকে।

হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড হয়ে গেল।

কাণ্ডটা এমন কিছু নয় যার জন্যে এতটা বিচলিত হতে হবে। কিন্তু মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান বিচলিত হলো। রেগে একেবারে গাল দুটো লাল করে ফেললে।

বহুদিন আগে থেকেই মিস সেনকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিল ফ্রেনী।

ফ্রেনী বলেছিল—কেন তুমি আবার মিছিমিছি বাড়ি-ভাড়া দিতে যাবে ? আমার নিজের এত ঘর যখন পড়ে রয়েছে—

সুতরাং সেই দিনই মিস-ফ্রেনী নিজের লোকজন পাঠিয়ে মিস সেনের জিনিষ-পত্র তুলে নিয়ে এসে বাড়ি খালি করে দিয়েছিল। বাকি ভাড়াও মিটিয়ে দিয়ে এসেছিল তারা। সুতরাং আর কোনও খরচ নেই তখন নমিতার। মিস ফ্রেনীর গাড়িতে চড়া, মিস ফ্রেনীর বাড়িতে থাকা-খাওয়া-শোওয়া। সব কিছুই মিস ফ্রেনীর খরচে। অর্থাৎ তখন একটা পয়সাও খরচ নেই। মাইনেটা তখন এসে জমে নমিতার হাতে পুরোপুরি। সেই পুরো টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়ে সারা মাসটা আবার মিস ফ্রেনী খরচ জুগিয়ে যায়।

মিস ফ্রেনী বলতো—তোমার নিজের কিছু খরচ করবার দরকার নেই, আমার টাকা তো রয়েছে।

কখনও বলতো—একটা শাড়ি কেনো মিস সেন।

—শাড়ি তো আমার অনেক রয়েছে মিস ফ্রেনী। আর কি দরকার ?

—তাহলে কিছু-না কিছু একটা কেনো।

—কিছু কিনতেই হবে ?

হয় একটা শাড়ি, নয়তো একটা গয়না, নয়তো একটা ফার্নিচার কিনে দেয় ফ্রেনী। মিস সেনকে কিছু দিয়েই যেন মিস ফ্রেনীর তৃপ্তি। কবে মিস সেনের বার্থ-ডে, কবে মিস সেনের শরীর-খারাপ, সমস্ত মিস ফ্রেনীর নখদর্পণে।

মিস সেনের যদি এতটুকু অযত্ন হয় বাড়িতে তো চাকরের চাকরি চলে যাবে। মিস সেনের যদি এতটুকু রাগ হয় কারোর ওপর তো মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের কাছে তার আর রেহাই নেই।

অফিসের মধ্যে কারো পানিশমেন্ট হয়েছে। মিস ফ্রেনীর কাছে গেলেই তার মুক্তি হয়ে যাবে। কিন্তু মিস ফ্রেনীর কাছে যাবার সাহস কারো নেই। তখন মিস সেনই ভরসা। মিস সেনকে ধরলেই সব সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে। মিস সেনের কথা ঠেলবার ক্ষমতা নেই মিস ফ্রেনীর।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড হয়ে গেল।

কাণ্ডটা এমন কিছু নয় যার জন্যে এতটা বিচলিত হতে হবে। কিন্তু মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান বিচলিতই হলো। রেগে গাল দুটো একেবারে লাল করে তুললো।

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান কল্পনাই করতে পারেনি যে এমন হবে !

বিকেল বেলা একটু বেরিয়েছিল মিস ফ্রেনী। তারপরে ইনকাম-ট্যাক্স ল-ইয়ারের সঙ্গে দেখা করে যখন ফিরেছে, তখন হঠাৎ ঘরে ঢুকেই অবাক।

সুশান্ত ! ! !

সুশান্তকে দেখেই আগুন উঠেছে ফ্রেনী।

এমন সময়ে হঠাৎ মিস ফ্রেনী এসে পড়বে বাড়িতে, তা দুজনের কেউই ভাবতে পারেনি। বাইরে গাড়ির শব্দ পেয়েই সুশান্ত পালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে।

সুশান্ত এমনি করে আগেও এসেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করেছে। কেউ জানতে পারেনি। সুশান্ত বলতো—তোমার বস জানতে পারবে না তো ?

নমিতা বলতো—তোমাকে ওসব কথা ভাবতে হবে না।

—কিন্তু যদি জেনে ফেলে ?

—জেনে ফেললে আর কী হবে ? কেটে তো আর ফেলবে না। কিন্তু তুমি না এলে যে আমার ভালো লাগে না।

সুশান্ত বলতো—আমারই কি ভাল লাগে নাকি ?

—তাহলে কী করি বলো তো ? চাকরি ছেড়ে দেব ?

—না না, মিছিমিছি চাকরি ছেড়ে দেবে কেন ? অতগুলো টাকা—

—আজকাল আর আমার টাকার ওপর কোনও মায়া নেই।

সুশান্ত বলতো—আমারও তো মায়া নেই।

নমিতা বলতো—টাকার জন্য আমি নিজের সব কিছু হারালাম—

—কেন, আমি তো রোজই আসি।

—কিন্তু এ-রকম লুকিয়ে আর কতদিন মিশবো। মনে হয় এর চেয়ে আগে বেশ ছিলুম। রোজ রাত্তিরে দেখা হতো—

—তা আরো টাকা জমিয়ে নাও না। তখন চাকরিটা ছেড়ে দিলেই হবে। ততদিনে আমারও প্রমোশন হয়ে যাবে।

নমিতার তবু যেন কেমন দ্বিধা হতো।

—জানো, আমি যদি মিস ফ্রেনীর বাড়ি ছেড়ে যাই তো বড় কষ্ট পাবে মনে মনে। আমাকে বড্ড ভালবাসে যে !

সুশান্ত রেগে যেত। বলতো—দরকার নেই অমন ভালবাসায়—

—কিন্তু সত্যি বিশ্বাস করো, আমি না হলে মিস ফ্রেনী কিছুই করতে পারে না। আমি সঙ্গে না খেলে মিস ফ্রেনীর খাওয়াই হয় না। আমি না শুলে মিস ফ্রেনীর ঘুমই আসে না আজকাল। আমি চাকরি ছেড়ে দিলে মিস ফ্রেনী বড় কষ্ট পাবে।

—তা মিস ফ্রেনীর কষ্টটাই বড় হলো? আমি কেউ নই?

নমিতা সান্ত্বনা দিত। বলতো—তুমি অত রাগ করো কেন? তোমার সঙ্গে তো দেখা হয়ই রোজ—

—এই লুকিয়ে লুকিয়ে আর কতদিন দেখা করবো?

নমিতা বলতো—দেখি না, কী করতে পারি—

এমনি করেই চলছিল দুজনের। এমনি করেই মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের চোখের উপর আর এক ট্র্যাজেডির বীজ পোঁতা হচ্ছিল। সে ট্র্যাজেডি যে কী রূপ নেবে, তা কেউই জানতে পারেনি।

সেদিন ফ্রেনী তালিয়ার খানের নজরে পড়তেই একেবারে বাঘের মত লাফিয়ে উঠেছে সে। জিজ্ঞেস করলে—তুমি?

সুশান্তর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

—কেন এসেছো এখানে? কী করতে এসেছো? হোয়াট ব্রট ইউ হিয়ার? টেল মি!

সুশান্ত তখনও চুপ করে রয়েছে। অন্য কোনও উপায় না দেখে আস্তে আস্তে পেছনে সরে যাবার চেষ্টা করছিল।

মিস ফ্রেনী খপ করে সুশান্তর হাতটা ধরে ফেলেছে। ফ্রেনীর হাতের শক্ত মুঠোর মধ্যে সুশান্ত কাঁপতে লাগলো।

—টেল মি, হোয়াই ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার? কেন তুমি এখানে এসেছিলে? কার পারমিশন নিয়ে এসেছিলে?

সুশান্ত কোনও উত্তর দিচ্ছে না তখনও।

ফ্রেনী চিৎকার করে ডাকলে—মিস সেন—

নমিতা এল।

ফ্রেনী জিজ্ঞেস করলে—এ কেন এসেছে এখানে? হোয়াই হি হ্যাজ কাম হিয়ার? তুমি ডেকেছিলে একে?

মিস সেনের মুখেও কথা নেই। বাড়ির ঝি চাকর দরোয়ান ড্রাইভার কুক বাটলার খানসামা সবাই চিৎকার শুনে এসে হাজির হয়েছে সামনে।

—টেল মি, তুমি ডেকেছিলে একে?

বাড়ির ভেতরে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানকে ভয় করে না এমন লোক কেউ নেই। ভারি গম্ভীর, ভারি খিটখিটে মেজাজের মনিব তাদের।

চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—কখন এ-লোকটা এসেছে বাড়িতে। দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে—সে-ও জানে না কখন কী-রকম করে এ-বাড়িতে ঢুকে পড়েছে সুশান্ত।

—স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডীড!

সঙ্গে সঙ্গে সকলকে ডিসচার্জ করে দিলে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান। এক মিনিটের মধ্যে তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল মিস তালিয়ার খানের বাড়িতে। বহুদিনের পুরোন দরোয়ান, বহুদিনের পুরোন চাকর। তাদের চাকরি গেল।

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের বিষনজরে যে একবার পড়েছে তার আর মুক্তি নেই কোনও রকমে, তা সবাই জানে।

এততেও মুক্তি পেলে না মিস সেন। ফ্রেনী সকলের সামনেই তাকে জিজ্ঞেস করলে—বলো, তুমি কি একে ডেকে এনেছিলে? বলো—

নমিতা বললে—না।

কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ মিস সেনের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো। আর চেপে রাখতে পারলে না। বালিশে মুখ লুকিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

পাশেই শুয়ে ছিল ফ্রেনী। সে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, মিস সেন? হোয়াট হ্যাপেনড?

মিস সেন মুখ লুকিয়ে তখনও কাঁদছে।

—কী হলো তোমার?

মিস সেনের মুখখানা হাত দিয়ে ফিরিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল ফ্রেনী। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ গাল কান সব লাল হয়ে গেছে মিস সেনের।

—কী হলো তোমার?

—আপনি ওকে অমন করে বকলেন কেন?

—কিন্তু তাতে তোমার কী?

—আমি যে ওকে আসতে বলেছিলুম। আমি যে ওকে ভালবাসি। বলতে বলতে মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের নরম বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে আবার হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো মিস সেন।

মিস সেনের কান্নায় ফ্রেনীর বুকটা পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এত করার পরেও মিস সেন এমন করে তাকে কষ্ট দিতে পারছে। চাকরিতে এত প্রমোশন দিয়ে দিয়েছে, নিজের বাড়িতে এনে রেখেছে। নিজে যেমন আরামে থাকে যেমন ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করে, মিস সেনকে ঠিক সেই রকম আরাম সেই রকম ঐশ্বর্যের মধ্যেই রেখেছে। তবু মিস সেনকে সুখী করতে পারলে না।

—কিন্তু কেন ওর জন্যে তুমি তোমার কেরিয়ার নষ্ট করতে চাও? ওই একটা হ্যাগার্ড ছেলের জন্যে?

নমিতা কোনও উত্তর দিলে না। কাঁদতেই লাগলো বুক ভরে।

—তুমি অন্য কোনও ছেলেকে বিয়ে করতে পারো, আমি আপত্তি করবো না। তোমার ভালোর জন্যেই তো আমি ওকে এখানে আসতে বারণ করেছি।

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলো—থামো মিস সেন, চুপ করো—

মিস সেন তত কাঁদতে লাগলো। কিছুতেই আর থামানো যায় না।

—আমি চাই তুমি অনেক বড় হবে, তুমি আরো অনেক বড় পোষ্ট পাবে, তুমি এই কাম্বালা হিলে বাড়ি কিনবে। আমিও যে তোমার ভালো চাই। ওর চেয়ে আমি কি তোমায় কিছু কম ভালবাসি ?

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—আপনি নভেলিস্ট, এর ব্যাখ্যা আপনি করবেন। আমি শুধু আপনাকে ঘটনাটাই বলে যেতে পারি। ক্যারেকটার যে সিচুয়েশন দিয়ে এক্সপ্লেন করতে হয় তা বোধহয় আপনাকে আর বলে দিতে হবে না। ন্যারেশন দিয়ে বোঝানো হতো সেখানে। কিন্তু কথায় আছে example is better than precepts—এও তাই। তাই পরের দিনই অফিসে গিয়ে ফ্রেনীব প্রথম কাজ হলো মিস সেনের আরো প্রমোশন।

—আরো প্রমোশন মানে ?

—মানে মিস সেনকে অফিসের টাকায় লণ্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা হলো।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন ?

মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—ট্রেনিংএর জন্যে—

কিন্তু আসল উদ্দেশ্য আলাদা। মিস সেনকে ইণ্ডিয়ার বাইরে পাঠালে হয়ত কোনও রকমে ছেলেটাকে ভুলে যেতে পারবে। হয়ত আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। হয়ত সেখানে কিছুদিন থাকলে দুর্বলতা কেটে যাবে। এও তো এক রকমের দুর্বলতা। চোখের আড়াল হলেই মানুষ ভুলে যায়। মানুষের মন তো জলের দাগের মত। হাওয়া জল লাগলেই সব মুছে একাকার হয়ে যায়।

মিস ফ্রেনীও সেই কথাই বললে।

এয়ার পোর্টে যখন তুলে দিতে গিয়েছিল তখন মিস সেনের চোখটা ভারি-ভারি হয়ে এসেছিল।

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান বলেছিল—ওটা হলো উইকনেস। তুমি কেন উইকনেসের স্লেভ হবে। তোমার সামনে ব্রাইট ফিউচার পড়ে রয়েছে। তুমি একদিন আমার মতই ফস্টার জনসন কোম্পানীর বিজনেস একজিকিউটিভ হবে—তুমি কেন একজন হ্যাগার্ডকে বিয়ে করে তোমার লাইফ স্পয়েল করবে? তোমার কিসের দায় পড়েছে? তোমার অভাব কিসের? আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোমার কিচ্ছু ভয় নেই—

আশ্চর্য! যতক্ষণ না প্লেনটা ছাড়ছিল ততক্ষণ যেন মিস ফ্রেনীর শান্তি হচ্ছিল না। এ-কদিন সামনে সামনে রেখেছে কেবল মিস সেনকে। কেবল বুঝিয়েছে। কেবল সান্ত্বনা দিয়েছে। কেবল আশা দিয়েছে। সে অনেক বড় হবে, অনেক বড়লোক হবে। আর মিস সেন একটা কথাও বলেনি। শুধু চুপচাপ শুনে গেছে ফ্রেনীর কথাগুলো।

কিন্তু প্লেনটা ছেড়ে চলে যাবার পরই মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান আর থাকতে পারলে না। তার চোখ দিয়েও জল বেরিয়ে আসতে চাইল।

আপনি নভেলিস্ট, এ নিয়ে আপনি পাতার পর পাতা ভরাতে পারবেন। অত ডিটেলস আমার বলার কথা নয়। আমি অত ডিটেলস বলতেও পারবো না।

ক্যারেক্টার যখন সৃষ্টি করে নভেলিস্টরা তখন প্রথমে ঝাপসা থাকে চেহারা। যত পাতার পর পাতা এগিয়ে যায় ততই ক্লিয়ার-কাট হতে থাকে। নাক মুখ চোখ থেকে সুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে উপন্যাসের শেষ চ্যাপ্টারে।

মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের ক্যারেকটারও সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো এ গল্পের চ্যাপ্টারে এসে। যা কেউ জানতো না, তাই-ই জেনে গেল সবাই। সবাই একদিন শুনে অবাক হয়ে গেল।

—কী শুনে ?

—আজ থেকে সাত বছর আগে হঠাৎ বোম্বের খবরের কাগজে খবরটা বেরোল সকালবেলা। খবরটা ছিল মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান তার নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে। কেন আত্মহত্যা করেছে তা কেউ জানে না। কিসের কষ্ট তার ছিল তাও কেউ জানে না। তার অগাধ সম্পত্তির প্রত্যেকটি উইল করে দিয়ে গেছে মিস সেনকে। মরবার আগেই উইল করে দিয়ে গিয়েছিল।

পুলিশ এসেছিল খবরের কাগজের লোকও এসেছিল। কিছুই বোঝা গেল না। বোঝা গেল না কেন আত্মহত্যা করতে গেল মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান। আগের দিনও অফিসে গেছে। অফিসে গিয়ে রীতিমত কাজ করেছে। তারপর যথারীতি বেবী-ষ্টুডিবেকার চালিয়ে বাড়ি এসেছে। কফি খেয়েছে, স্নান করেছে রোজকার মত। তারপর ডিনারে বসেছে।

ডিনার খাবার মধ্যেই একটা টেলিগ্রাম এসেছিল।

টেলিগ্রাম করেছিল মিস সেন। লণ্ডন থেকে। টেলিগ্রামে লেখা ছিল মিস সেন লণ্ডনেই সুশান্তকে বিয়ে করেছে। সেই খবরটা জানানোই ছিল টেলিগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য।

সেই টেলিগ্রামটা পাবার পর থেকেই যেন মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়েছিল ডিনার-টেবল থেকে। তারপর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর কারোর সঙ্গে কথা বলেনি। চাকর-আয়া-বাটলার কাউকে ডাকেনি অন্য দিনের মত। তারপরে চাকর বাকররা ঘুমিয়ে পড়েছিল। যে যার ঘরে। সকাল বেলা দরজা বন্ধ দেখে প্রথমে কেউ কিছু বলেনি। তারপর সকাল আটটা পর্যন্ত যখন দরজা খুললো না তখন সন্দেহ হয়েছিল তাদের মনে। তারা পুলিশকে খবর দিয়েছিল। টেলিগ্রামটা বালিশের তলায় পাওয়া গেল।

কিন্তু এ গল্প কার ক্যারেক্টারের? মিস ফ্রেনী তালিয়ার খানের?

মিস্টার সেনগুপ্তর কাছে গল্পটা শুনে আমার তাই-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু তখনও জানতাম না যে এ মিস্টার সেনগুপ্ত আর মিসেস সেনগুপ্তর ক্যারেকটারেরও গল্প। জানলাম অনেক পরে? তখন মিস্টার সেনগুপ্ত আমাদের পাড়ার বাড়ি বিক্রী করে দিয়ে ইউ. এস. এ চলে গিয়েছেন। সেখানেই বসবাস করছেন তখন।

আমার এক বোম্বের বন্ধুর কাছে গল্পটা বলেছিলাম।

তিনি বললেন—আরে, মিস্টার সেনগুপ্ত আর মিসেস সেনগুপ্তই তো মিস তালিয়ার খানের সব প্রপার্টি পেয়েছেন।

আমি ভেবে দেখেছি, এ সংসারে আমরা সবাই কেউ নায়ক কেউ নায়িকা হয়ে জন্ম নিয়েছি। কেউ সুমিতা, কেউ বিপন [illegible], কেউ আলোচনা দাসী, কেউ হরিপদ, আবার কেউ বা মিস ফ্রেনী তালিয়ার খান। এখানে সবাই লীলা করতে এসেছি আর লীলা সাঙ্গ হলেই আমাদের চলে যেতে হয়। কিন্তু এই নায়ক-নায়িকার ঊর্ধ্বে আর একজন মহা-নায়ক আড়ালে বসে বসে আমাদের হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখ নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখে চলেছেন। তিনিও লেখেন। এই জগৎ-সংসারের খাতার পাতায় তাঁরই হস্তাক্ষর প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমরা দেখতে পাই না। যে দেখতে পায় সে-ই হয় টলস্টয়, সে-ই হয় ব্যালজাক, সে-ই হয় ডিকেন্স, সে-ই হয় শরৎচন্দ্র। তাদের প্রণাম করেই এ-গ্রন্থের উপসংহার টানলাম। নমোস্তেস্তু।